তত্ত্বসিন্ধু

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

তত্ত্বসিন্ধু

মুখবন্ধ

হে পথিক, পৃথিবী কি শুধু তোমার (অনন্ত জীবনের) চলার পথের পান্থশালা? কিছুদিনের জন্য পথিক হিসাবে বিচরণ করে সুখ আনন্দ স্ফূর্ত্তি আমোদ প্রমোদের মধ্যে আত্মহারা হয়ে শেষবেলায় সেই আত্মহারার হারাতে ডুবে, হিসাবের খাতায় শুধু হতাশা, নিরাশা, দুঃখ, ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আবার ফিরে যাওয়া? কিন্তু পথিক কোথা থেকে এলে? কিসের জন্য এলে? আবার কোথায় ফিরে যাবে, কিছুই তো জানলে না। শুধু জন্মগ্রহণ করা আর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জন্যই কি এই বিরাট সৃষ্টি? সেতো হতে পারে না। তাই জন্ম মৃত্যুর মাঝপথে প্রকৃতির গতির টানে টানে যেতে যেতে জেনে নিতে হবে পথিক সৃষ্টির অনন্ত রহস্য। কিন্তু কে জানাবে সেই পথ?

আনন্দ স্ফূর্ত্তি আমোদ প্রমোদের ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পথিক আজ দিশেহারা। আজ নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক সঙ্কট, কর্মশৈথিল্য, বিভ্রান্তি আর হতাশার মলিন ছবি এমনই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, পথিক তার নিজের পথ, নিজের পরিচয়ই ভুলে গেছে।

আবার আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে কোন সুষ্ঠ সমাধান আজও হল না। কোন ধর্ম কোন দেশে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারল না। ধর্মের সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে আজ নানারকম অবিচার অনাচার চলেছে। যার ফলে আজ চারিদিকে সামাজিক বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সমাধানের পথ কে বলে দেবেন? কেই বা দিতে পারেন সেই সমাধানের পথ? সৃষ্টি যখন হয়েছে, তখন তার রহস্য উদ্ঘাটিত হবেই। প্রশ্ন যখন রয়েছে, তখন সমাধানও হবেই। অপূরণকে পূরণ করাই সৃষ্টির ধর্ম।

এইসকল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, সেই চিরন্তন পথের সুলুক সন্ধান তিনিই দিতে পারেন, যিনি পূর্ণ হয়ে আসেন অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি মহান হয়ে আসেন। এই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্তগতির সাথে সবার গতি এক করে তিনিই মিশিয়ে দিতে পারেন। জীবের পরবর্ত্তী ব্যবস্থার গুরুভার তিনিই বহন করতে পারেন। তাইতো তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সবাইকে আহবান জানাচ্ছেন, ''হে পথিক, তোমরা জাগো। তোমরা জাগাও সেই কুলকুন্ডলিনী, মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্রে, সেখান থেকে সহস্রারে। বাজাও সেই সুরধ্বনি যে সুর বাজালে আপনি জেগে উঠবে তোমার অন্তরাত্মার জাপ্য ধ্বনি। তখন সবকিছু জানতে পারবে, কেন এসেছো? কোথা থেকে এসেছো? কোথায় যাবে? নিজেকে তখন চিনতে পারবে। কেন তোমার জন্ম? কেন দেহ নিয়ে এসেছো এই পৃথিবীতে? কিছুই জানতে বাকী থাকবে না। এরজন্য তোমায় যেতে হবে না কোন মঠ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জায়। তোমার অন্তরাত্মার মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় জেগে উঠবে এই মূলসুর। এরজন্য আলাদা করে তোমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে না, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে যেতে হবে না। সংসারে থেকেই তোমাদের সব হবে। শুধু নিজ নিজ দেহবীণাযন্ত্রে সপ্তসুরের ঝঙ্কার উঠাও।''

জন্মমৃত্যুর মাঝপথে প্রকৃতির গতির টানে টানে সপ্তসুর বাজিয়ে পথিক জেনে নাও বিশ্বের অনন্ত রহস্য। খুঁজে বের করো সেই নিখোঁজের সুর। তবে পথিক চল আমরা যাই সেই নিখোঁজ সুরের খোঁজে কখনও শ্যামবাজারের ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ-এ, কখনও ১৫৫নং পার্কষ্ট্রীটে, কখনও রাজা বসন্তরায় রোডে, কখনও বা পাম এ্যাভিনিউ-এ। আবার কখনও বিভিন্ন ধর্ম সভায়।

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বেদতত্ত্ব কখনো একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন মীটিং ও ধর্মসভায় শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব পান্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত) ছোট

ছোট পুস্তিকা আকারে প্রচারের গুরু দায়িত্ব. তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন বিভাগও গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন **"অভিনব দর্শন"**।

"অভিনব দর্শন" প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদস্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে. নবম শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল **তত্ত্বসিন্ধু**।

পরিশেষে এই বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২

চপল মিত্র
(প্রকাশক)

রাম নারায়ণ রাম

নিবেদন

পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীতে এবং বহু ভাষণে আমরা জেনেছি যে, বেদের যুগে বেদজ্ঞরা, ঋষি সন্তানেরা ৫০ জন ৫০ জন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বেদপ্রচারে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁরা আদিপালিভাষায় বেদের ধ্বনিতে সুর দিয়ে মধুরকণ্ঠে দেশবাসীকে শোনাতেন এবং তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। এইভাবে বেদের সন্তানগণ সমস্ত দেশে বেদের প্রচার করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতো আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু তার বাণীকে পাথেয় করে বাস্তবে রূপায়নের পথে আমরা এগিয়ে এসেছি কজন?

এবিষয়ে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, রানীগঞ্জ, কুলটি, নন্ডী, আসানসোল ও চিনাকুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের সন্তানদলের ভাইবোনেরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দাবী করতে পারে। তারা পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ নির্দেশকে মাথায় নিয়ে বেদের বাণী বহন করে 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামকে পৌঁছে দিয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব ও বাণীর সহজ সরল অর্থকে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের মনের গভীরে এমনভাবে গেঁথে দিতে পেরেছে যে, হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসেছে সুখচরধামে পরমপিতার শ্রীচরণ দর্শনের আশায়। শ্রীশ্রীঠাকুর পরম প্রীত ছিলেন তাদের কর্মধারার প্রতি এবং তিনি তাদের এইভাবেই কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের কর্মপ্রবাহ আজও চলেছে সমানভাবে। তাই তাদের সংগৃহীত পরমপিতার তত্ত্বভান্ডারকে তারা উন্মুক্ত করে দিয়েছে গণপ্রচারের স্বার্থে প্রকাশন বিভাগের কাছে।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব-সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা রচনার কাজে সাহায্যের জন্য যেভাবে অশ্বিনী বিশ্বাস, বিজয় চক্রবর্ত্তী উত্তম চ্যাটার্জী, হেমন্ত সেনগুপ্ত, যজ্ঞেশ্বর নায়েক, মিহির মন্ডল, তাপস মন্ডল শ্রীমতি গৌরী গাঙ্গুলী, সাগর মন্ডল, পঙ্কজ রায়, সন্দীপ গুহ, অসিত গুপ্ত, শক্তি বিশ্বাস প্রমুখ ভাইবোনেরা এগিয়ে এসেছে, তাদের এ প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। আমরা তাদের অন্তরভরা ভালবাসা সহ বৈদিক শুভেচ্ছা জানাই **রাম নারায়ণ রাম**।

চপল মিত্র

শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২

প্রকাশক

স্রষ্টার মনের বহিঃপ্রকাশই এই জীব জগৎ

ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কোলকাতা
১১ই অগাষ্ট, ১৯৫৭, বৈকাল ৫-৩০ মিঃ

Class অনেকদিন হলো, তত্ত্বও অনেক বলা হয়েছে একই তত্ত্ব বহুভাবে বোঝানো হয়েছে। সত্তা একই থাকে। তত্ত্ব সে তার এক গতিতেই চলে। নানা দৃষ্টান্তে নানাভাবে, একটা ভাবকে বজায় রাখবার জন্য বারবার বলা হয়েছে। এটা গল্প নয়, তত্ত্বের বেলায় রসাল করে জাঁকজমক করে বলার কিছু থাকে না। তত্ত্ব ভিতরকার জিনিস টেনে এনে বলা হয়। বাইরে থেকে তার সূচনা, যে সূচনা দিয়েই ভিতরে প্রবিষ্ট হতে হয়। ভিতরের যা কিছু, প্রকাশ করে দেওয়াই হচ্ছে তত্ত্বের কাজ। সুতরাং বহুদিন যাবৎ বহুরকমভাবে তত্ত্ব যে বলা হয়েছে, তাতে একটা সত্তার কথাই বলা হয়েছে। সুপ্ত অবস্থায় যা জাগরিত থাকে, তাকেই জাগানো হয় ঘুমের মাঝে স্বপ্নের ভিতর। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ থাকে, বাহ্যিক সংজ্ঞা থাকে না। ঘুমে বাইরের দৃষ্টি যেমন বিলুপ্ত থাকে, অনেক বোঝার জিনিস সেইরূপ বাহ্য অবস্থায় বিলীন থাকে। কিন্তু চৈতন্য বা প্রাণ, তার সম্পূর্ণ পূর্ণ অবস্থায় পূর্ণ থাকে জানার জন্য। এখন যে না জানার অবস্থা, বুঝতে না পারার অবস্থা, ইহা ঘুমন্তের অবস্থা। সুপ্ত অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান

তত্ত্ব ভিতরকার জিনিস টেনে এনে বলা হয়। বাইরে থেকে তার সূচনা, যে সূচনা দিয়েই ভিতরে প্রবিষ্ট হতে হয়। ভিতরের যা কিছু, প্রকাশ করে দেওয়াই হচ্ছে তত্ত্বের কাজ।

যেমন রহিত থাকে, কিন্তু সমস্ত চেতন চৈতন্যে ভরপুর থাকে, তেমনই সবাই আমরা ঘুমিয়ে আছি, বুঝতে না পারার অবস্থাতে। আমরা জেগেও ঘুমিয়ে আছি।

এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রগুলো শূন্যে আছে। এই যে শূন্যে আছে সূর্য, সে কার ধ্যান করছে? অগণিত পদার্থ যাহা নিয়ে সূর্য হয়েছে, তারা কার ধ্যান করছে? কোন্ চিন্তার প্রভাবে, কি প্রভাবে, কোন্ নিয়মাবলীর দ্বারা তারা চলছে, খুঁজে দেখা যায়? একে তোমরা স্রষ্টাই বল, ভগবানই বলো, আর যাই বলো, সেটা আবার কোথা থেকে এল? মীমাংসা আর হয় না। সে (সূর্য) শূন্যেতে থেকে নিজস্ব সত্তাকে পরিপূর্ণ করতে চায়। পরিপূর্ণ করতে যে চাইছে, তাহা স্বাভাবিক ইচ্ছা। এখান থেকে লন্ডন পর্যন্ত শূন্য যদি বসিয়ে যাও, সব শূন্যের আগে এক বসালেই শূন্যের দাম হয়। এই যে শূন্য আছে, তা হতে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সেই ইচ্ছাটাই কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে অগণিত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে।

এই যে অগণিত সৃষ্টি, এই রূপই অগণিত রূপের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। এই পরিপূর্ণতার ধারা সমস্ত বস্তুর ভিতর রয়েছে। যে বস্তু হতে নানা বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে, এই ফুল বল, গাছ বল, বীজ বল, মানুষ বল, সবাই আমরা আপন আপন কক্ষে থেকে নিজস্ব সত্তাকে পরিপূর্ণ করার অভিলাষে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা চাই পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ। ইংরাজী ভাষায় হোক, বাংলা ভাষাতেই হোক, যত ভাষাতেই অভিমত ব্যক্ত করতে করতে এগিয়ে যাও, সবাই চাইছে পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ। সবাই চায় পরম জ্ঞান, পরম শান্তি। এই যে চাওয়া, এইগুলি যদি আমরা সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকি, এই ব্যবহারের মূল যে অন্তর্নিহিত ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা হতে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, অনন্ত জীবলোক সৃষ্টি হল, আমাদের ভিতরও সেই ইচ্ছাই প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা কোন্ ধ্যান করবো? কার ধ্যান করবো? কি চিন্তা

যে বস্তু হতে নানা বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে, এই ফুল বল, গাছ বল, বীজ বল, মানুষ বল, সবাই আমরা আপন আপন কক্ষে থেকে নিজস্ব সত্তাকে পরিপূর্ণ করার অভিলাষে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা চাই পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ।

পৃথিবী যখন ধূম্রাকারে ছিল, গলিত অবস্থায় ছিল, সে নিজস্ব ধ্যানে নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যের গহ্বরে ঘুরতে আরম্ভ করলো। ঘুরতে ঘুরতে গাছপালা আপনভাবে ফুটতে আরম্ভ করলো। তারই পরিচয় এই পরিবর্তনশীল জগৎ।

করবো? ধ্যানের সূত্র আমাদের ভিতরে যে আছে; যেটা আমাদের ভিতর রয়েছে, আমরা স্বাভাবিকভাবে যে ধ্যান করে আসছি, তাহাই করণীয়। আমরা শূন্যে আছি, যেভাবে শূন্যের উপর রয়েছি, ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই যে শূন্য যার রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, কিছু নেই, এর ভিতর যে একটা সূর্য, আমরা তার উপসনা করছি। সেটাই আমরা চিন্তা করছি। এই পৃথিবী, এই যে অনন্ত জগতের সৃষ্টি, এই ভাব সেই ভাবধারা হতে এসেছে। পৃথিবী যখন ধূম্রাকারে ছিল, গলিত অবস্থায় ছিল, সে নিজস্ব ধ্যানে নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যের গহ্বরে ঘুরতে আরম্ভ করলো। ঘুরতে ঘুরতে গাছপালা আপনভাবে ফুটতে আরম্ভ করলো। তারই পরিচয় এই পরিবর্তনশীল জগৎ। সুতরাং এই মহাশূন্যের গর্ভে পৃথিবী যদি তার কক্ষে থেকে নব নব সৃষ্টি করে যেতে পারে, আমাদের এই দেহক্ষেত্রও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত। পৃথিবী যেমন তার নিজস্ব কক্ষে থেকে কাজ করে যাচ্ছে, আমরাও যদি আমাদের কক্ষে থেকে কাজ করি, নব নব সৃষ্টির ধারা আমাদের ভিতর হতেও বের হবে। আমরা চিন্তা করবো, সেই মহাশূন্যের স্তর। মন্ত্র হচ্ছে নাদ, মন্ত্র হচ্ছে নিনাদের সুর। আমরা যদি সেই মহামন্ত্র জপ করি, সেটাকে আশ্রয় করে আমরা যদি আপনভাবে শূন্যের উপর চলতে থাকি, তবে এই অণিমা লঘিমা শক্তিগুলি আপনি ধরা দেবে। সব বিভুতি তোমার নিকট ছোট হয়ে যাবে। সব শিশুর মত তোমার কাছে ধরা দেবে। আমাদের ভিতর সৃষ্টি ক্ষমতা হয়ে যাবে।

ভিতরে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে বলে ঘুমন্ত অবস্থায় অল্প ডাক দিলেই যেমন জেগে ওঠে, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় বুঝের ক্ষেত্রে আমরাও অজ্ঞান অবস্থায় আছি। এই যে না জানার অবস্থা, এটা আবার একটা জ্ঞানেরই অবস্থা। জ্ঞান ও অজ্ঞান, উভয়ই হচ্ছে সচেতন। অজ্ঞান অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থা বা না জানার অবস্থা। এই অবস্থায় ডাক দিলে সে জাগে। যিনি জেগে আছেন, তিনি ঘুমন্তকে ডাকছেন। বলছেন, ‘‘তুমি জাগো। নিজেকে চেতনাধীন

যিনি জেগে আছেন, তিনি ঘুমন্তকে ডাকছেন। বলছেন, ‘‘তুমি জাগো। নিজেকে চেতনাধীন করো। জ্ঞানের অবস্থায় থাকো। যে জ্ঞান আমাদের ভিতর অহর্নিশ বইছে, তাকে ডেকে জাগিয়ে দাও। তাকে ডেকে অজ্ঞান অবস্থা বিলীন করে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা কর। বল, হে জ্ঞান, হে চৈতন্য, তুমি সজাগ হও।’’

করো। জ্ঞানের অবস্থায় থাকো। যে জ্ঞান আমাদের ভিতর অহর্নিশ বইছে, তাকে ডেকে জাগিয়ে দাও। তাকে ডেকে অজ্ঞান অবস্থা বিলীন করে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা কর। বল, হে জ্ঞান, হে চৈতন্য, তুমি সজাগ হও।’’ চৈতন্য তো সজাগ। সে আবার জাগবে কি করে? যেমন কুয়াশা, মেঘ ইত্যাদি সূর্যকে ঢেকে রাখছে। আবার এই যে মেঘ, বর্ষা, জল, কুয়াশা, ইহারা সূর্য ছাড়া নয়। এইসব সূর্যেরই বিভিন্ন অবস্থা। সূর্য না থাকলে এদের অস্তিত্ব থাকতো না। সুতরাং এরা হচ্ছে সূর্যের আর একটি রূপ। অজ্ঞান আছে বলেই কুয়াশা রয়েছে। সূর্যের তাপেই এরা সরে যায়। সূর্যের তাপেই বৃষ্টি। তাই বৃষ্টি দেখলে সূর্যকে ভাবা উচিত, কুয়াশা দেখলেও তাই। অজ্ঞান জ্ঞানেরই একটা রূপ। জ্ঞান নিজেকে নিজে আবৃত করে রেখেছে অজ্ঞানরূপে। জ্ঞান নিজেকে নিজে উদ্ভাসিত করছে জ্ঞানরূপ রাস্তার ভিতর দিয়ে। তার ভিতর দিয়েই জ্ঞান সূর্য নিজের স্বরূপ প্রকাশ করছে। প্রত্যেকের ভিতর অজ্ঞানতা রয়েছে। কিন্তু যারা বলছে, ‘বুঝি না’, এটা সাংঘাতিক কথা। তার ভিতর জ্ঞান পুরোপুরি থেকেও সে বলছে, ‘জ্ঞান নাই।’ এতে ভাববার কিছুই নাই। তার জ্ঞান সূর্য মেঘে ঢেকে আছে। তাদের ভিতর জ্ঞান পূর্ণত্বে আছে। তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এটা (জ্ঞান) জাগছে, জাগবে বা জাগানো যায়। কি করে এই জ্ঞান সূর্যকে লাভ করা যায়? সেই আলো কি করে পাব? সেইজন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। এই যে উদগ্রীব হয়ে আছি, এই যে অনুশোচনা, এটাই জ্ঞানলাভের সূচনা। এই যে সবসময় মনের ভিতর চাঞ্চল্যের অবস্থা, তটস্থ ভাব, আফশোস; এই ভাবটাই হচ্ছে প্রকাশ করার ভাব, জানার জন্য ব্যাকুলতা, জানার জন্য আগ্রহ। এই

এই যে সবসময় মনের ভিতর চাঞ্চল্যের অবস্থা, তটস্থ ভাব, আফশোস; এই ভাবটাই হচ্ছে প্রকাশ করার ভাব, জানার জন্য ব্যাকুলতা, জানার জন্য আগ্রহ। এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করে অজ্ঞান ব্যক্তির কী হয়? এরফলে আমাদের দুঃখ অনুশোচনা, ভিতরকার যন্ত্রণার অবস্থা, জ্বালার অবস্থা, সবগুলি জ্ঞান সূর্যের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

ব্যাকুলতা প্রকাশ করে অজ্ঞান ব্যক্তির কী হয়? এরফলে আমাদের দুঃখ অনুশোচনা, ভিতরকার যন্ত্রণার অবস্থা, জ্বালার অবস্থা, সবগুলি জ্ঞান সূর্যের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এই যে যুক্ত অবস্থা, এই যে যোগাযোগ, ইহাই যোগ। ইহাই স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মে চলেছে। স্বাভাবিক নিয়মে, এই যোগ নিয়ে জীব জন্মগ্রহণ করছে। এই যোগ অবস্থাই প্রকাশমান হয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেটা আবার বহুমুখী হয়ে বহুভাবে দেহের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয় ও রিপুর দ্বারা জ্ঞান সূর্যের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় আছি। তার যে তত্ত্ব, তার যে ব্যক্তিত্ব, সেটা ইন্দ্রিয়ের ভিতর আমাদের সজাগ করিয়ে দিচ্ছে।

আমরা এখানে সংসার করছি, ছেলে হচ্ছে, মেয়ে হচ্ছে, কাম কাঞ্চন সবই আছে। এগুলি হচ্ছে সেই পরিপূর্ণতার ইন্ধনে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত। যা কিছু হচ্ছে প্রকারান্তরে আমরা সর্ব অবস্থায় শূন্যে পড়ে আছি। আমরা যদি শূন্যে আছি, চিন্তা করে নিই মাঝে মাঝে, তাহলে সামঞ্জস্য থাকে। না ভাবলেই বিভ্রান্ত হই, সন্দিগ্ধতা আসে।

যা কিছু করছি, শূন্যে আছি, শূন্যে মিশে যাচ্ছি, এই অবস্থাটা যখন ধাতস্থ হবে, তখন দেখবে, আমাদের ভিতর দিয়ে অনর্গল সুর বইতে থাকবে। এতটুকু থালা রেকর্ড (record) এর প্যাঁচে পিনের খোঁচায় বের হয় গান। রেকর্ডের রেখার প্যাঁচে আছে এমনই শক্তি যে পিনের (Pin) খোঁচা দেওয়ার সাথে সাথে বেজে উঠছে। এইভাবে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি শক্তি ও অনন্ত বিশ্বের যে শব্দ ধ্বনি নাদ ছড়িয়ে আছে, মনরূপ Pin যদি লাগাও, তবে বেজে উঠবে। রেকর্ডের রেখার ন্যায়, Coil-এর মত দেহে অগণিত শিরা উপশিরা রূপ প্যাঁচ রয়েছে। দেহক্ষেত্রেই সব রয়েছে। এই যে অবস্থাটা, এটাই যোগ। আমরা যে যোগাযোগে রয়েছি, এটুকু বুঝলেই যথেষ্ট। এই যোগ, এই ধ্যান কাম, ক্রোধ, মায়ামোহ সাংসারিক কোন কিছুতেই আটকায় না বা ধরতে পারে না। এখানে সংসারের কোন আবিলতা ওকে আটকাতে পারে না।

এই যোগ, এই ধ্যান কাম, ক্রোধ, মায়ামোহ সাংসারিক কোন কিছুতেই আটকায় না বা ধরতে পারে না। এখানে সংসারের কোন আবিলতা ওকে আটকাতে পারে না। কিন্তু এখানকার সংসারে যে বিধিব্যবস্থা চলছে, তাতে ভগবান পাওয়া দুষ্কর।

কিন্তু এখানকার সংসারে যে বিধিব্যবস্থা চলছে, তাতে ভগবান পাওয়া দুষ্কর। আর এই নিয়ম ময়দার গোলার ন্যায় গোলা করা আছে। ভগবানকে ইচ্ছামতন সন্দেশ, রসগোল্লা করতে পার। এই পথে ভগবানকে একেক সময় একেকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। পিঠালির মত ভগবান হঠাৎ চানাচুর হয়ে গেল, জিলিপি হয়ে গেল। আরও কথা হল, আমাদের এখানকার শাস্ত্রের ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে পথে সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, সে পথ দিয়ে যদি ভগবান আসে, তারপর ভোগলামিতে পড়ে। আমাদের এই পথের দরকার নাই। ভগবান থাকবেন প্রত্যক্ষ। এই যে ফুল দেখছ, এতেই হয়ে গেল।

চাক্ষুষ দর্শনে, প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে যে ভগবান, সেই ভগবানই তোমাদের ভগবান। কাম ত্যাগ করলে যদি ভগবান পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের কারও ভগবদ্দর্শন হবে না। কাম কেহ ত্যাগ করতে পারে না। কাজেই সে দেশে ভগবান আসতে পারে না। এখানে যারা বলেছেন, কাম ত্যাগ করেছেন, সত্যের অপলাপ করেছেন। কাম কেউ ছাড়তে পারে না। নারী পুরুষ সঙ্গমেই শুধু কাম নয়। কাম সমস্ত দরজায়। শুধু একটা দরজা বন্ধ করলেই হয় না। এখানে যারা বড় বড় ভগবান অবতার হয়েছে, তারা নদী পাহাড় দেখতে ভালবাসেন, সুন্দর দৃশ্য দেখতে, সুন্দর ফুলের গন্ধ শুঁকতে ভালবাসেন, অনেকে অনেক কিছু ভালবাসেন। কাজেই তৃপ্তিই কাম। কাপড় উঠাতে উঠাতে লেংটি হলো, তবুও ভগবান পেলো না। যে নিয়মগুলি আদি শাস্ত্রে আছে, সেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে। ‘পতিতে তারিতে হবে তারিণী,’ হয়ে গেছে ‘পাঁচিশে তারিখে হবে বারুণী’। টীকা, ভাষ্য, উবাচ এত হয়ে গেছে যে, শাস্ত্রের কথা এখন নিজের কথা হয়ে গেছে। সবকিছুর মাঝে সমতা ও যুক্তি থাকলে সেটাই গ্রহণীয়।

চাক্ষুষ দর্শনে, প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে যে ভগবান, সেই ভগবানই তোমাদের ভগবান। কাম ত্যাগ করলে যদি ভগবান পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের কারও ভগবদ্দর্শন হবে না।

আজ এখানে ধর্মের নামে যা চলছে, শাস্ত্রের নিয়মগুলি অধিকাংশই বিকৃত হয়ে গেছে। এখানকার নিয়মে মহানের সাথে একটি মেয়েকে দেখা

এক ঘর পাই পয়সা নিয়ে যেতে হলে দফারফা শেষ। তার চেয়ে আমরা যদি Universal Bank হতে একটা Cheque কেটে নিয়ে চলি, এক ঘর টাকার পরিবর্ত্তে, তাতেই কাজ হবে। আমার কথা হলো, ওদের কথা শোনার দরকার নেই। ওরা দর্শনের জন্য, সিদ্ধি মুক্তির জন্য পাগল।

গেল, গেল এখানকার ভগবান। কাম ছাড়তে হবে। ওই নীচুর দিকে তাকিয়ে ছাড় ছাড় ভাব সর্বদা। ভিতরে সবকিছুই আছে। এখানে ভগবান সাজা, গুরু সাজা শাস্তি। শাস্তিতে চলতে পারবে না। সিনেমায় যাওয়া যাবে না। বুদ্ধের ভুলক্রমে একটি বাচ্চা হয়ে গেছে। তা যদি না হতো, কেহ বিশ্বাস করতো না যে, বুদ্ধ এর ভিতর গেছিল। তাহলে বলতো, বুদ্ধের এসব কিছুই ছিল না। কাম কেউ ছাড়তে পারবে না এটাই সত্য। তারা যদি তাদের নিয়মে চলতে চায় চলুক। এক ঘর পাই পয়সা নিয়ে যেতে হলে দফারফা শেষ। তার চেয়ে আমরা যদি Universal Bank হতে একটা Cheque কেটে নিয়ে চলি, এক ঘর টাকার পরিবর্ত্তে, তাতেই কাজ হবে। আমার কথা হলো, ওদের কথা শোনার দরকার নেই। ওরা দর্শনের জন্য, সিদ্ধি মুক্তির জন্য পাগল। তোমরা সব কিছু করবে। স্বামী থাকবে, স্ত্রী থাকবে, ঘরবাড়ী থাকবে। তার ভিতরে একটা Cheque নিয়ে চলবে। দরকার হচ্ছে একটা Cheque সবসময়। এখন এদের (সাধুদের) শোচনীয় অবস্থা। সবসময় হেঁ হেঁ করে থাকতে হবে। এখানে সাধু সাজা এক বিরাট বিড়ম্বনা। কাউকে যদি বাবাজী ডাকলো, তবে হয়ে গেল। বাবাজীর অবস্থা রক্ষা করতে তাকে বহু শাস্তি সহ্য করতে হবে। শুধু হায় হুতাশ করছে। আমাদের হায় হুতাশ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের পাপেরও দরকার নাই, পুণ্যেরও দরকার নাই। এগুলি টোকাতে (কুড়াতে) গেলেই মুস্কিল। সকাল থেকে উঠে প্রত্যেকেই ঘুরতাছে কে কাকে খাবে। কেহ কাহাকে ছাড়ে না। খাওয়াখাওয়ি চলছেই। একেবারে হুলুস্থুলু ব্যাপার।

শ্বাসে প্রশ্বাসে কত জীব তুমি মারছো। মারামারির খেলা চলেছে চারিদিকে। শুধু মানুষ মারলেই কি পাপ হয়? পশু হত্যা করাও কি না মহাপাপ। আমরা যদি শূন্যের উপর হতে মানুষকে মেরে ফেলি, সেটা

শ্বাসে প্রশ্বাসে কত জীব তুমি মারছো। মারামারির খেলা চলেছে চারিদিকে। শুধু মানুষ মারলেই কি পাপ হয়? পশু হত্যা করাও কি না মহাপাপ।

কি হত্যা হল না? শূন্য হতে এতটুকু দেখা যায় মানুষকে। একটুকু বীর্যপাতে একটা ইলিশ মাছের খোলতে (থলি) ভরে যায়। সেই খোলতের প্রতিটি বাচ্চাই যদি বেঁচে যায়, তাহলে একটা নদী ভরে যাবে। এতটুকু বীর্যপাতে (যা ফেলে দিয়েছে), কত প্রাণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কামত্যাগ না করলে যদি ভগবান না পাওয়া যায়, তবে দর্শন তো দূরের কথা, কোনদিনই কিছু হবে না। দেহের সব বৃত্তিই এক একটি সুর। তুমি সুরের বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছ। দেহের কোন বৃত্তিই ত্যাগ করা যায় না। এই ঢেউ-এর সুর বৃত্তির খেলা, সুরের খেলা। তোমার যতক্ষণ দেহ আছে, তুমি ভালবাসছো। তোমার বৃত্তিগুলো ঠিক থাকলো। তোমার বীজ সত্তা ঠিক আছে। যন্ত্র তোমার ঠিক আছে। কাজেই এই ঠিকের ভিতর দিয়ে সবকিছু ঠিক করতে হবে। এই যে ফুল দেখছো, কি চমৎকার। ফুলের সৌন্দর্যের ভাবে একটা কবিতা মনে এল। পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে বিভোর হয়ে গেলে; এটাও কামের অবস্থা। এই যে প্রত্যেকের সাথে সাথে মনে মনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, এইটাও একটা পরিতৃপ্তির অবস্থা। আমাদের বৃত্তিগুলো যাতে খেলতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা। যেমন কবুতরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওড়ায়, ঠিক তেমনিভাবেই বৃত্তির নিবৃত্তির মাঝে মাঝেই রয়েছে এই সুরের খেলা। বাচ্চা শিশু বড়ো হচ্ছে। মিশছে আস্তে আস্তে করে। তার বৃত্তিকে যাতে জগতের বস্তুর সঙ্গে খেলিয়ে খেলিয়ে পাকাপোক্ত করতে পারে, এগুলো তারই পাঠ। বিড়াল আস্তে আস্তে করে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে বাচ্চাকে ইঁদুর ধরতে শেখায়। ডাইনে বাঁয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে বাচ্চাদের শেখায়। বাচ্চারা তার ওপর দিয়ে লাফায়। বাচ্চাদের খাদ্য শিকার করতে যদি না শেখানো হয়, তবে অসুবিধা হবে। তারপর শিকার ধরা শিখে নিলে বিড়ালের বাচ্চারা যা পায়, তার উপরই লাফায়।

বাচ্চা শিশু বড়ো হচ্ছে। মিশছে আস্তে আস্তে করে। তার বৃত্তিকে যাতে জগতের বস্তুর সঙ্গে খেলিয়ে খেলিয়ে পাকাপোক্ত করতে পারে, এগুলো তারই পাঠ।

তোমাকে চিমটি দিলে উহ্ করলে, টের পেলে চৈতন্য আছে বলেই।

আমাদের ভিতর যে যন্ত্র আছে, তা ঠিক না বেঠিক, প্রকৃতি হতে সবসময় বুঝিতে দিচ্ছে। এই যে সৃষ্টি, সৃষ্টি হলো কেন? ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক আছে কি না? বাইরের প্রকাশের দ্বারা, ভাবের দ্বারা এই মন দিয়েই, এই যন্ত্র দিয়েই সেই যন্ত্র বাজাতে হবে। তাতেই জানিয়ে দিচ্ছে, সমস্ত তার ঠিক আছে কি না। সাতটা তারের সাতরকম আওয়াজ। সেতারের সাত তারে যেমন এ্যাঁ, ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করে সাতরকম আওয়াজ হয়! এই সাতটা তারের সাতটা আওয়াজের যেমন দরকার হয় একটা সুরের মিলতি রাখার জন্য, সেইরূপ আমাদের ভিতরের তারগুলি কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ যদি সাজিয়ে বাজানো যায় এবং গান করা যায়, তবেই সমতা রক্ষা হবে, সব দৃষ্টি ঠিক থাকবে।

ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক আছে কি না? বাইরের প্রকাশের দ্বারা, ভাবের দ্বারা এই মন দিয়েই, এই যন্ত্র দিয়েই সেই যন্ত্র বাজাতে হবে। তাতেই জানিয়ে দিচ্ছে, সমস্ত তার ঠিক আছে কি না।

তত্ত্ব বুঝতে হলে, প্রকৃত তত্ত্ব জানতে হলে চর্চা করতে হবে। যে যত বেশী চর্চা করবে, সে তত বেশী জানবে। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সবসময় মন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুমিয়েও মন দৌড়াচ্ছে। মন সবসময় নিজস্ব গতিতে চলছে, কাজ করে যাচ্ছে। মন কারও জন্য অপেক্ষা করে না। জ্বলন্ত উনুন হতে সবসময় যেমন তাপ ওঠে, সেইরকম মনটা তাপের মত শিস্ হয়ে উঠে যাচ্ছে। মনের কোন সংজ্ঞা নাই। মনকে কোথাও খুঁজে পাবে না। মন সবসময় তাপের মত বয়ে চলেছে। মন Universal Seed (সমস্ত ইউনিভার্সের বীজস্বরূপ)। মন এত ছড়ানো রয়েছে যে, এটাকেই বলছে যেন, প্রধান তারের সুর। বাতাস যেমন বয়ে চলেছে, জল যেমন বয়ে চলেছে, সেইরূপ মনও সবসময় বয়ে চলেছে। শিস্ সবসময় বয় কি না। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে মন শিস্ হয়ে বইতে থাকে। এটা দেহের লয় করে; দেহ ক্ষয় করে নিয়ে চলেছে। নানা রোগ শোকের শেষে শেষ নিঃশ্বাস হয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে। যোগীরা কি করেন? তাঁরা ঐ তাপটিকে আটকে রাখেন ও কাজে

যোগীরা কি করেন? তাঁরা ঐ তাপটিকে আটকে রাখেন ও কাজে লাগিয়ে চলেন। না আটকালে এই তাপ, এই শিস্ অজস্রভাবে ব্যয় হয়ে চলেছে।

লাগিয়ে চলেন। না আটকালে এই তাপ, এই শিস্ অজস্রভাবে ব্যয় হয়ে চলেছে। শহরে সমস্ত নর্দমার ময়লা একত্র করে গ্যাস ওঠানো হয়। তারপর সেই গ্যাসকে আটকে 'আলো' (বিদ্যুৎ) উৎপন্ন হয়। সেই আলো কত স্নিগ্ধ, কত সুন্দর, দেখতে ভাল লাগে। এই যে ক্লেদ, নানারকম পঙ্কিলতা, রোগ, শোক, দুঃখ যাই হোক না কেন, মনের ভিতর শিস্ বা তাপের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড গতিতে ধাঁ ধাঁ করে চলেছে। এটাকে আটকাতে গেলে দেখবে, জ্বলে উঠবে। যোগীরা এই তাপকে আটকেছে।

মহারাজ ২০ লক্ষ টাকা দান করেছেন। কিন্তু জন প্রতি পেল চার আনা। আমরা বলাবলি করছি, মহারাজ এত বিরাট, আমরা পেলাম মাত্র চার আনা। যাওয়া আসা, বাসের খরচও মিটলো না। দেনেওয়ালা কিন্তু সবাই। তোমরা ব্যয় ঠিকই করে যাচ্ছ। মায়ের পেট থেকে পড়ে এখনও পর্যন্ত মনরূপ যে ধন ব্যয় করছো, তার হিসাব করেছ কখনও? মনকে কোথায় না দিচ্ছ? রাগেতে দিচ্ছ, হিংসাতে দিচ্ছ, লোভে দিচ্ছ, কামে দিচ্ছ। খেলতে যাও, সিনেমায় যাও, অফিসে, বাজারে, হাটে যেখানেই যাও, সর্বত্র সর্বজায়গায় সকলকে একটু একটু করে মন দিয়ে যাচ্ছ। অনেক পাওনাদার। তাই হিসাবে দেখা যায়, কেহই কিন্তু তেমন কিছু পেল না। দেনেওয়ালা ঠিক দিয়ে যাচ্ছে। ভারি মজার ব্যাপার। তাহলে কি করতে হবে? এটাকে যদি আটকাও, তাহলে অনেক কিছু করা যাবে। মহারাজ যদি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা কাজ করতেন, যেমন একটা মিল (Factory) স্থাপন করলেন বা বিরাট ক্ষেত খামার করে দিলেন, তাহলে অনেক লোকের কর্ম্মসংস্থান হতো, অনেক লোককে প্রতিপালন করতে পারতেন। এই খুচরো খুচরো, টুকরো টুকরো দিয়ে তাঁর সব ব্যয় হয়ে গেল। আবার কেউ তেমন কিছু পেল না। আমরাও দিতে আছি সবই। কিন্তু পাচ্ছি না

দেনেওয়ালা কিন্তু সবাই। তোমরা ব্যয় ঠিকই করে যাচ্ছ। মায়ের পেট থেকে পড়ে এখনও পর্যন্ত মনরূপ যে ধন ব্যয় করছো, তার হিসাব করেছ কখনও? মনকে কোথায় না দিচ্ছ? রাগেতে দিচ্ছ, হিংসাতে দিচ্ছ, লোভে দিচ্ছ, কামে দিচ্ছ।

শুধু আফশোসই সার হলো। অথচ তোমাদের ভিতর ভরপুর থাকতে, এতকিছু থাকা সত্ত্বেও রাখতে পারছো না। এতবেশী দান করে ফেলেছ, যেন এখন কিছুই নেই।

কিছু। দর্শন, স্পর্শন, অনুভূতি কিছুই হলো না। শুধু আফশোসই সার হলো। অথচ তোমাদের ভিতর ভরপুর থাকতে, এতকিছু থাকা সত্ত্বেও রাখতে পারছো না। এতবেশী দান করে ফেলেছ, যেন এখন কিছুই নেই। কাজেই যদি একটা মিল (Factory) খোলা যায়, তার ভিতরে অনেক জিনিস তৈরী করতে পারবে। যাতে Capital বা মূলধন (টাকা) ঠিক রইল। আবার ঐ অর্থ দ্বারাই আরও অর্থ সংগ্রহ করার উপায় (পথ) রইল। তাহাই প্রকৃত ব্যবসা। কিন্তু ব্যবস্থা ঠিক না হলে সবই ব্যর্থ। মনকে মূলধন (অর্থ) করে বিরাট কাজে যদি Concentrate (মনঃসংযোগ) করা যায়, তবে সেই অর্থের দ্বারা যে অর্থের ব্যবস্থা হবে, তাহাই পরমার্থ। টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। মনের আখ্যা আছে, ব্যাখ্যা আছে, বিরাট ক্ষমতা আছে। এই অর্থের এপিঠ হচ্ছে বাস্তব আর ওপিঠ হচ্ছে পরমার্থ। একটারই এপিঠ ও ওপিঠ। আর কিছু নয়। দেখা গেল, ভিতরে জিনিস ঠিকই আছে।

মনের আখ্যা আছে, ব্যাখ্যা আছে, বিরাট ক্ষমতা আছে। এই অর্থের এপিঠ হচ্ছে বাস্তব আর ওপিঠ হচ্ছে পরমার্থ। একটারই এপিঠ ও ওপিঠ। আর কিছু নয়। দেখা গেল, ভিতরে জিনিস ঠিকই আছে।

এখন মূলতত্ত্ব হচ্ছে সেই পরমার্থ লাভের জন্য নিজের ভিতর একটা Factory করতে হবে। নিজের ভিতর কি করে Factory খুলবো? ঘর লাগবে, যন্ত্রপাতি লাগবে, কয়লা লাগবে, খুটখাট মাকু চালাতে হবে। আবার আগুনের আঁচ আছে, ধোঁয়া আছে। এই Factory-তে কত কিছুই না লাগে। এই দুনিয়াটা একটা Factory, পৃথিবীটা মনের রাজত্ব। মন বিরাট, ব্যাপক। তোমার মনটাকে সকলের মন করে ফেল। মন একটাই থাকে। যেমন একটা টাকাই সবার কাছে ঘোরে। লোহাওলা কিনছে, মুদিওয়ালা, সোনাওয়ালা, মাছের দোকানে ঘুরছে। এই টাকা রোজগারের জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। কেউ কলম পিষে, কেউ মাকু চালিয়ে, কেউ গাঁট কেটে টাকা রোজগার করছে। টাকা বলে, "হম ঠিক হ্যয়।" পকেটমার পকেট মারছে। আবার টাকা দিয়ে ফুল

মন আছে বলেই এই দেখাশুনা, চলাফেরা, ভালবাসা, কামকামনা, রোগ, শোক মন থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে। এই মন থেকে যদি জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সকলেই আমরা মন রাজত্বের ফ্যাক্টরীর (Factory) কর্মচারী।

কিনে ঠাকুরের বাড়ি পূজা দিতে যাচ্ছে। আরে, সকল বেটাই ঐ টাকা রোজগারের জন্য ছুটছে। জলে ডুবছে, রাস্তা দিয়ে ট্যাং ট্যাং করছে। কাজ করনেওয়ালা কাজ করে, সিঁদওয়ালা সিঁদ কাটে, ব্যবসাওয়ালা ব্যবসা করে। এই টাকার লগে লগে (সঙ্গে সঙ্গে) সকলকেই ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে। আমরা কি করছি? 'মন' কথাটা সবারই সমান। সবারই মন আছে। পিঁপড়ার আছে, হাতীর আছে। এইটাকে (পৃথিবীটাকে) মনের রাজত্ব বলে। মন থেকেই সব সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই মনে মনে রাজত্ব করতে হবে। মন আছে বলেই এই জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। মন আছে বলেই এই দেখাশুনা, চলাফেরা, ভালবাসা, কামকামনা, রোগ, শোক; মন থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে। এই মন থেকে যদি জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সকলেই আমরা মন রাজত্বের ফ্যাক্টরীর (Factory) কর্মচারী। আমরা ফ্যাক্টরীর কি কাম করতে আছি? কোন মিলে জুতা হয়, কোন মিলে কাপড় হয়, কোন মিলে খাবার বানায়। Electric লাইন একটা। এক বয়লার হতেই ময়দার কল, মাখনের কল সবই চলে। এই মন রাজত্বের Factory হতে (পৃথিবী একটা মিল বা Factory) হরেক রকমের বাচ্চা হচ্ছে। আমাদের ছেলেপুলে, পিঁপড়ার বাচ্চা, বাঁদরের বাচ্চা, কাকের বাচ্চা থেকে চাল, ডাল, তেল, লবণ ইত্যাদি হরেক রকমের হাজার হাজার জিনিস, এই মন রাজত্বের Factory হতে বের হচ্ছে। কতগুলো মাল (জিনিস) আবার মিলে পড়ে থাকে। কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো, তাকে 'Waste' বলে, তা থেকে গাড়ির গদী, জাজিম তৈরী হচ্ছে। আমাদের মনের রাগ, দ্বেষ সেইরূপ 'Waste'. কিন্তু Waste ঠিক নয়। সবই কাজে লাগে। তখন আয় ব্যয় সমান হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার একটা প্রেস দিয়েছিলাম। কাজ কর্ম চললো। পাঁচ ছয় বৎসর পর দেখি আয় ব্যয় সমান। আয় ব্যয় সমান থাকলে চলবে না। ব্যবসায়ে লাভ করতে হবে। লাভ খুঁজতে গেলে কি করতে হবে?

নদীর এপাড় ভাঙ্গে, ওপাড় গড়ে। মনটা যে যে পর্দা হতে বের হচ্ছে অর্থাৎ যে কেন্দ্র হতে মনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মন দিয়েই সেইসব কেন্দ্রস্থলের আজ্ঞা সহস্রার চিন্তা করতে হবে। যে মানুষ কৃশ (রোগা), ট্যাং ট্যাং-এ আছিল, ব্যায়াম করে সেই মানুষ আবার পালোয়ান হয়ে গেল।

নদীর এপাড় ভাঙ্গে, ওপাড় গড়ে। মনটা যে যে পর্দা হতে বের হচ্ছে অর্থাৎ যে কেন্দ্র হতে মনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মন দিয়েই সেইসব কেন্দ্রস্থলের আজ্ঞা সহস্রার চিন্তা করতে হবে।

হাত-পা নাড়তে নাড়তে হাড়ে মাসে ছিল, Muscle (মাস্‌ল্) ফুললো। এই যে হাত ছিল, সেটাই বারবার কসরৎ করতে করতে সবল হয়ে উঠলো। এই শরীরটাই বেড়ে গেল। আর একটা শরীর হতে তো আসে নাই। তোমাদের কসরৎ করতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে। যেখান থেকে মনের উদ্ভব হচ্ছে, মনের সেই flow (ধারা) আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে সঞ্চালন করতে করতে, মনের দ্বারের বাহুগুলি (ইন্দ্রিয়গুলি) কসরৎ করতে করতে মনন শক্তি বাড়াতে হবে। ধীরে ধীরে মনের সেই কেন্দ্রগুলি সতেজ হয়ে উঠবে। তখন তুমি সেই মনঃশক্তির গভীরতায় পৌঁছে গেলে। যেমন আগে যে হাতে ৫/১০ সের নিতে পারতো, ব্যায়ামের ফলে এখন সেই হাতে কয়েক মণ তোলে। যা কিছু কাজকর্ম সব তোমার মনের ক্ষমতা দিয়ে করছো। মনকে বলো, 'ওঠো পরিশ্রম করো।' তখন দেখবে, মন উঁচু হচ্ছে। ভিতরে উঁচু হচ্ছে, বাইরে উচ্চতা নয়। তখন মন জাঁতাকলে পড়েছে। বলছে, 'বাবা'। তখন মন খুব বেড়ে উঠলো। তোমার মনের বলও সঞ্চয় হয়ে গেল। এই মনের বলে বল (শক্তি) সঞ্চয় করে অনেকে বুকের উপর হাতী চালিয়ে দেয়। এই মনের বল যদি সঞ্চয় হয়ে যায়, তোমাদের ভিতর আটক হয়ে যাবে। তখন দেখবে তোমাদের এই মন সবকিছু টেনে নিয়ে আসছে। তোমার যা চিন্তা করবার সোঁ সোঁ করে নিয়ে আসবে।

৮০ টাকা রোজগার করতে যে পরিশ্রম করতে হয়, আর একটু সুন্দরভাবে মননশক্তিকে প্রয়োগ করলে ৮০ লাখ টাকা হয়। খুব যে বেশী পরিশ্রম করতে হবে, তা নয়। তখন Bank থেকে Cheque কাটতে পারবে।

যে ব্যক্তি ৮০ টাকা বেতন পায়, সে ৮০ লাখ টাকার চিন্তা করতে পারে। ৮০ লাখ টাকা মনের Bank চেক কেটে দিল। এই ৮০ লাখ টাকা ৮০ টাকা হতেই এসেছে। ৮০ টাকা হতে কেমনে ৮০ লাখ টাকা হয়ে যায়। বাচ্চা তো অনেক। আসলে মূলে ২টা (স্বামী-স্ত্রী)। আমি পূজার সময় একবার দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আমরা সকলে মিলে ৭৫জন ছিলাম। বসে পূজা দেখছি। ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা, এই দুইজন থেকে এতগুলি হয়ে গেছে। ৮০ টাকা রোজগার করতে

যে পরিশ্রম করতে হয়, আর একটু সুন্দরভাবে মননশক্তিকে প্রয়োগ করলে ৮০ লাখ টাকা হয়। খুব যে বেশী পরিশ্রম করতে হবে, তা নয়। তখন Bank থেকে Cheque কাটতে পারবে। ৮০ টাকা রোজগার করতে যা দরকার, তার মত পরিশ্রম করতে কতটা মননশক্তির প্রয়োজন? কোন্ কেন্দ্র থেকে কোন্ বস্তুর উপর মনটা রাখবে? যে বিষয়বস্তুর উপর মন রাখবে, তার সার বের করে ফেলবে। মাথায় করে মোট (মাল) নিয়ে যদি ৫০ মাইল হেঁটে যেতে হয়, তাহলে ব্যবসা করা চলে না। ট্রেন থাকলে সুবিধা হয়। এই মাথা (মস্তক) থেকে ট্রেনের আবিষ্কার হয়েছে। মাল টানা গাড়ীতে অনেক মাল থাকে; গরু, ঘোড়া টেনে নিয়ে যায়। আবার এই ব্যাটা (ট্রেনটা) খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে হাজার হাজার গরু, ভেড়া টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই ট্রেনের সব ব্যবস্থা মন থেকেই হয়েছে। এই মন থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। জগতের যা কিছু সব মন থেকেই উদ্ভূত। তাই সহজেই বলা যায়, সৃষ্টি করার অধিকার বা শক্তি তোমার ভিতরে আছে। সেইরূপে তুমি রূপকার হও। তোমার ভিতরকার মন দিয়ে আবিষ্কার করতে করতে চল। স্রষ্টা এই মন দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। জীব যে স্রষ্টা হতে চলেছে, তাহলে জীবের ভিতরেও সেই মন দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করার অধিকার বা শক্তি থেকে যাবে।

এই মন থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। জগতের যা কিছু সব মন থেকেই উদ্ভূত। তাই সহজেই বলা যায়, সৃষ্টি করার অধিকার বা শক্তি তোমার ভিতরে আছে।

স্রষ্টা এই একটা মন দিয়েই অগণিত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নিজের সম্পূর্ণ মনকে পূর্ণভাবে পূর্ণত্বে রেখে জীবকে তা দান করে গেছেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিজস্ব মন দিয়ে, সব কিছু দিয়েই জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আমরা স্রষ্টার সেই মহামূল্য দানকে, সেই মনকে বহন করে যাচ্ছি। আমাদের ভিতরেও অনন্ত ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। তবে সেই মনকে চালিয়ে আমরা সব কিছু আয়ত্ত করতে কেন পারবো না? সবকিছু করার

স্রষ্টা এই একটা মন দিয়েই অগণিত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নিজের সম্পূর্ণ মনকে পূর্ণভাবে পূর্ণত্বে রেখে জীবকে তা দান করে গেছেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিজস্ব মন দিয়ে, সব কিছু দিয়েই জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

অধিকার সব জীবের মনের ভিতর রয়েছে। কেন জীব দেশলাই দিয়ে আলো জ্বালছে? ওস্তাদ ঠিক আছে। একটা বিড়ির ধোঁয়ার মধ্যে বিড়ির মাথায় সূর্যকে নিয়ে চলেছে। এক একটা দেশলাই এর মধ্যে ৬০টা কাঠির মাথায় ৬০টা সূর্য বেঁধে রেখেছে। বিড়ি খেতে খেতে যেন সূর্য খেয়ে ফেলছে। বিড়ির মাথায় অগণিত সূর্য রেখেছে, জোনাকি পোকার মত ফুঁচ ফুঁচ করে জ্বলছে। বড় করতে পারে না। কিন্তু ছোট হলে কি হবে, জোনাকির আলোর মত আলো তৈয়ারী করলেও ঐ একটা দেশলাই কাঠিতে সূর্যের চেয়ে কম শক্তি নেই। ঐ একটা কাঠি জ্বালিয়ে সমস্ত পৃথিবী পোড়ানো যায়। আবার ঐ পৃথিবীর সঙ্গে অন্য পৃথিবীও জ্বলে ছাই হয়ে যেতে পারে। আমরা বিড়ির আগায়, দেশলাই কাঠির আগায় সূর্যকে রাখি। আমরা কম নাকি? স্রষ্টা বলছেন, একটা কাঠির তেজ এত; তাহলে তোমাদের মধ্যে আরও কত ক্ষমতা আছে।

একটা বিড়ির ধোঁয়ার মধ্যে বিড়ির মাথায় সূর্যকে নিয়ে চলেছে। এক একটা দেশলাই এর মধ্যে ৬০টা কাঠির মাথায় ৬০টা সূর্য বেঁধে রেখেছে। বিড়ি খেতে খেতে যেন সূর্য খেয়ে ফেলছে।

“তোর মধ্যে কত শক্তি দিয়েছে, বুঝতে পারিস? এখন ঠিকভাবে খাটা, ব্যয় কর। মাথা ঠিক আছে। বুদ্ধি ঠিক আছে। কুলি মজুর থেকে শুরু করে আমরা সবাই সূর্যকে কাঠির আগায় রেখেছি। একে ভিতরে নিতে হবে।” এ আগুন যেখান হতে উদ্ভব হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রস্থল আছে, স্রষ্টা সেখানে নিতে বলেছেন। একটা কূপ (কুয়া) কাটতে গেলে বুঝে কাটতে হয়। তোমার এখনকার (৬০ বৎসর) photo আর ২০ বৎসর বয়সের photo কি এক? দেখলে চেনা যায়? গান শিখতে গেলে বিভিন্ন মাত্রা আছে, পরতে পরতে (স্তরে স্তরে) পরদা আছে। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থলে মনকে নিবিষ্ট রেখে কসরৎ করে অগ্রসর হতে হয়। বসে আছ, কথা বলছো, প্রত্যেকেরই গাঁইট বা পরদা আছে, (সুইচের জায়গায়ই সুইচ টিপতে হয়) সেখানে টিপতে হবে। ভিতরের সুইচ আজ্ঞা সহস্রার। যাঁরা জাননেওয়ালা, তাঁরা দেখিয়ে দেন। যেমন Electric মিস্ত্রি ঠিক সুইচে হাত দিয়ে টিপে দেয়। এখন সুইচ না টিপে সুইচে হাত দিয়ে বসে আছে। কারেন্ট বা শক্ একটাতে লাগলে আর একটাতে লাগে। দেখছো তো, কেমন টানতে টানতে চলেছে। সুইচ

খুলতে গিয়ে এমন লাগাই লাগছে যে, যেই ধরতে গেছে, সেই লেগে (আট্‌কে) গেছে।

৫০০ লোক (কারেন্টে) লেগে গিয়ে ‘আ’ করে বসে আছে। এখানে কিন্তু রোগে টানছে, শোকে টানছে, ভালবাসা টানছে। আবার মায়ে টানে, পোলো মাইয়া টানে, ‘কয় বাড়ী করমু, রোজগার করমু।’ সুইচ খুলতে গিয়ে লাগার মত লেগে গেছে। তারও আবার উপায় আছে। বাড়ি (আঘাত) দিয়ে ছাড়াইয়া দিতে হয়। লোহা দিয়ে দিলে হবে না। বাঁশ দিয়ে বাড়ি দিতে হয়। বাড়িটা কি? একটা শব্দ। শব্দটাই ভিতরে বাড়ি। সাঁপুড়ে বাঁশি বাজাইয়া সাপ ধরে। ভিতরকার সাপকে শব্দের দ্বারা (ভিতরকার শব্দ আর মন্ত্র এক) জাগাতে হয়। মন্ত্রের দ্বারা ভিতরকার কুলকুন্ডলিনী সর্প জেগে ওঠে। সাপ শীতে বেরোয় না। বাঁশীর আওয়াজ শুনে সজাগ হয়ে ওঠে। তুমি সবসময় সুর দিলে জেগে উঠবে। মন্ত্র যদি বারবার উচ্চারণ কর, ভিতরের সাপ জাগবে। আমার এক শিষ্য সাপের ওঝা। মন্ত্র হিসেবে সে কতগুলি শব্দ উচ্চারণ করে। তার মন্ত্রটা গালিগালাজ। ছড়া পাঁচালি করে কত অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে সে সাপ ধরে নিয়ে আসে। এটাই হচ্ছে বকার (বকুনি খাবার) দেবতা। সাপের কাছে এই অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজই মন্ত্র। এইগুলিতে যদি সাপ আসে, তোমাদের মন্ত্রেও সাপ জাগবে। আর এটারও গালিগালাজ আছে। যথা— ‘মন বসে না। দূর, আর বসবো না’। মেজাজ খারাপ হয়। তুমি বারবার মন্ত্র উচ্চারণ কর। ভিতরকার সাপ তখন জেগে উঠতে থাকে। ছেড়ে দিলে আবার নুইয়ে পড়ে। আবার যখন মন্ত্র উচ্চারণ করবে, ভিতরে একটা সুর সুন্দরভাবে থাকে। সাপটা ভাবতে থাকে, “আমারে কে ডাকে, কে ডাকে, এমন সুন্দর সুর।” ভাবে আর সে উঠতে থাকে। লেজটা মূলাধারে রেখে সহস্র ফণা নিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে আজ্ঞাচক্রের দিকে উঠে আসতে থাকে। মনে হয়, হাট বাজারের শব্দ, একটা কলরব যেন আসছে। অনন্ত শক্তির সুপ্ত ধারা, বিশ্ববিরাটের সমস্ত শক্তিধারা এখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই শক্তিটা কি জান? এটার (আজ্ঞাচক্রের)

মন্ত্রের দ্বারা ভিতরকার কুলকুন্ডলিনী সর্প জেগে ওঠে। সাপ শীতে বেরোয় না। বাঁশীর আওয়াজ শুনে সজাগ হয়ে ওঠে। তুমি সবসময় সুর দিলে জেগে উঠবে। মন্ত্র যদি বারবার উচ্চারণ কর, ভিতরের সাপ জাগবে।

ভিতর দিয়ে তখন অনন্ত নাগ সহস্রারে সহস্র ফণা বিস্তার করে থাকে। সেই অনন্ত নাগের অনন্ত মাথা মানে বিশ্বজগতের সমস্ত মাথা অনন্তকোটি ফণা হয়ে চতুর্দিকে বিস্তার করে রসাস্বাদ গ্রহণ করছে। সে তখন কি দেখছে? তুমি দেখলে বিলাতে কথা কইছে, ঐ নক্ষত্র থেকে কথা কইছে, মনে হচ্ছে এখানে কথা হচ্ছে। সমস্ত কাছাকাছি হয়ে গেল। এর ক্ষমতার, এর গতির এতবড় speed যে, স্রষ্টা অনন্তমুখী হয়ে যেমন অগণিত সৃষ্টি করেছেন, তুমিও যেন স্রষ্টার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলে। সেই স্রষ্টার শক্তি তোমার মাঝে প্রবাহিত হতে থাকলো। তখন তোমার ভিতর দিয়ে অগণিত সৃষ্টি চলছে। এই জীবজগত সমস্ত সৃষ্টি তোমার অধীনে এসে গেল। কত সুন্দর, কত সুস্পষ্টভাবে অগণিত সৃষ্টি করার অধিকার তোমার হয়ে গেল। গুরু যিনি (জন্মসিদ্ধ হয়েই এসেছেন), যে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনি সেই মন্ত্রদান করছেন।

সেই স্রষ্টার শক্তি তোমার মাঝে প্রবাহিত হতে থাকলো। তখন তোমার ভিতর দিয়ে অগণিত সৃষ্টি চলছে। এই জীবজগত সমস্ত সৃষ্টি তোমার অধীনে এসে গেল।

গুরুপ্রদত্ত সেই মন্ত্র বারবার তুমি আপনমনে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক উচ্চারণ করে চলবে। উচ্চারণ করতে করতে সপ্তসুর সপ্তধারায় যা চলছে, তা তোমার অধিকারে আসবে। অহর্নিশ সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে চলবে। তাহলে প্রকৃতির প্রকৃত রূপ, সেই স্বরূপের স্বরূপত্বে তুমি প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি এবং স্রষ্টা যে একেতে অর্থাৎ একত্বে যে আছ, সেই বোধ তখন বোধগম্য হবে। সেই বোধ তোমাদের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হলে, অনন্ত সুরধারায় সুরময় হয়ে বিশ্বের সকল সুর আস্বাদন করতে পারবে। প্রকৃতির ইচ্ছার পূর্ণ রূপায়ণ তোমার মাঝেই হবে। আজ এই থাক।

গুরুপ্রদত্ত সেই মন্ত্র বারবার তুমি আপনমনে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক উচ্চারণ করে চলবে। উচ্চারণ করতে করতে সপ্তসুর সপ্তধারায় যা চলছে, তা তোমার অধিকারে আসবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শব্দ ও বস্তুর সম্মিলিত ও যুক্ত অবস্থাই সৃষ্টির কারণ

ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার জন্মাষ্টমী
১৮ই অগাষ্ট, ১৯৫৭, সময় ঃ- বৈকাল ৫-৩০ মিঃ

নাদ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। নাদ অর্থ শব্দ। যা কিছু শব্দ যেমন নিন্দা, স্তুতি, গালিগালাজ ইত্যাদি যাবতীয় শব্দ অর্থাৎ যে কোন শব্দই নাদ। একই শব্দ একই মুখ হতে, জিহ্বা হতে বের হয়। গালি বল, মন্ত্র বল — যা কিছু বলা যায়, ভালও বলা যায়, খারাপও বলা যায়। কেউ বত্রিশ দাঁতে, কেউ আঠাশ দাঁতে, যার যা আছে, তাইতেই কথা বলে। এই শব্দের মাধ্যমে কথা বলে বলে একেকজন কবি, বক্তা, শয়তান, Writer (লেখক) ইত্যাদি হাজার হাজার রকমের হয়ে যাচ্ছে। এই শব্দ বা ধ্বনি শূন্যের মাঝে, ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এবং সেটা বুঝতেও পারা যাচ্ছে।

এই যে অহর্নিশ কথা বল না বল, শব্দ বা ধ্বনি মনের মাঝে সদা সর্বদা কথা বলার মতন হয়ে চলেছে। মন থেকে সবসময় ভিতরে শব্দ হয়ে হয়ে একটা শিসের মত হয়ে বয়ে চলেছে। সেটা কখনও বা জানা যায়, কখনও জানা যায় না। সেটা যখন জানা যায়, একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, জীব সবসময় কোন না কোন চিন্তা ছাড়া থাকতে পারে না। মনটা সবসময় জাগরণে শয়নে,

এই যে অহর্নিশ কথা বল না বল, শব্দ বা ধ্বনি মনের মাঝে সদা সর্বদা কথা বলার মতন হয়ে চলেছে। মন থেকে সবসময় ভিতরে শব্দ হয়ে হয়ে একটা শিসের মত হয়ে বয়ে চলেছে। সেটা কখনও বা জানা যায়, কখনও জানা যায় না।

স্বপনে চলছে। এই যে মনটা চলছে, কে চালাচ্ছে? একটা জিনিস যখন চলতে থাকে, বইতে থাকে তখন তো কোন একটা জিনিসকে আশ্রয় করে চলে। এই যে চলা, চলতে গেলেই বুঝতে হবে, একটা কিছু আছে। মন চিন্তা করছে, শুয়ে বসে চলতে ফিরতে, দেহ থেকে একটা জিনিস শিসের মত বেরিয়েই চলেছে। একটা জিনিস আশ্রয় করেই মন যাচ্ছে। একটা রাস্তা ছাড়া তো যেতে পারে না। জল যেমন বয়ে যায় তার পথ (রাস্তা) দিয়ে, সেরকম মনও তার বেরিয়ে যাবার রাস্তা দিয়েই বের হয়। মন যে বয়ে যাচ্ছে একটা বহনকারী তো মনকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন বহন করে নিয়ে যেতে হলে স্পর্শ করে নিয়ে যেতে হয়। একটা জিনিসের সংঘর্ষণ মাত্র শব্দ হয়, স্পর্শ মাত্র শব্দ হয়। এই যে মনটা বয়ে যাচ্ছে, শোষাইয়া শোষাইয়া সবসময় চলছে, তারও একটা শব্দ আছে। সাপ যখন যায়, তারও একটা শব্দ হয়। ঐ শব্দ বা ধ্বনিটা কিসের? স্রষ্টা সৃষ্টি করবার সময় ঐ শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার জগৎ সৃষ্টির কারণ শব্দ ও বস্তুর সম্মিলিত ও যুক্ত অবস্থা। দুইটা শব্দ একত্রিত হয়ে আর একটা শব্দ হয়। এ জগতের যা কিছু অর্থাৎ সবকিছুই শব্দের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সবকিছুই একটা সংযুক্ত বা যুক্ত অবস্থায় আছে। সাংসারিক যাবতীয় যা কিছু দেখছো, শব্দ বা ধ্বনি বা নাদ থেকে হয়েছে।

স্রষ্টা সৃষ্টি করবার সময় ঐ শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার জগৎ সৃষ্টির কারণ শব্দ ও বস্তুর সম্মিলিত ও যুক্ত অবস্থা।

এই যে ফুলটা দেখছো, এটা যে ফুল, কি করে বুঝলে? একটা ধ্বনি পেলাম। এর ভিতরে নাদ আছে, ধ্বনি আছে। এটা দেখাও যা, মেঘের যে গুম গুম শব্দ বা আওয়াজ, একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ নাদ, সেটাও এক। এই ধ্বনি তত্ত্ব এক অনন্ত ধারায় বয়ে চলেছে। যে জিনিসটা দেখছো, যার পরিবর্ত্তন আছে, লয় আছে, ক্ষয় আছে, তার ধ্বনি আছে। যেটা তুমি দেখছো, সেই রূপটাই শেষ নয়। এই যে ফুল, ফুল থেকে ফল। ফল থেকে বীজ। বীজ থেকে গাছ। গাছ থাকে মাটিতে।

শুধু যে মুখে কথা বলা যায় তা নয়, চোখও কথা বলতে পারে। চোখ দিয়ে শব্দ করে। কথা বলতে না পারলেও চোখ হাসে, কাঁদে। চোখ দেখিয়ে হাসানো যায়। চোখ দেখিয়ে বিদায় করা যায়, কাঁদিয়ে দেওয়া যায়।

এটা শুকিয়ে যাবে, ক্ষয় হয়ে যাবে। এই জিনিসটা থাকে না। এই রূপ আর থাকে না। এই রূপটা এখানকার রূপ। এটা পরিবর্ত্তন হচ্ছে আর একটা রূপে। যেমন রেলওয়ে যাত্রার পথে ষ্টেশন থাকে। ট্রেন থেমে থেমে যাচ্ছে। এই বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন ষ্টেশন। এও থেমে থেমে, একেক রূপে একেক ষ্টেশনে থেমে থেমে চলে যাচ্ছে। এটা শুকিয়ে গেল। হাওয়ায় মিশে গেল, ধুলায় গেল। অগণিত রূপে অর্থাৎ বহুরূপে চলে গেল ফুলটা। কাজেই দেখা গেল, যে জিনিসের পরিবর্তন আছে, তাহারই গতি আছে, শব্দ আছে। তোমরা কথা তো বলছো। কথা বলে কে? এই যে জিহ্বা, দাঁত টোকাটাকি দিয়ে কথা বলছো। কে কথা বলছে, তাকে খুঁজে পাচ্ছ না। কথা বলে কে? সেই কথাওয়ালাকে খুঁজে আর পাবে না। দাঁত মুখ তিন চারখান বাড়ি দিয়ে চললো। জিহ্বাটা কি কথা বলে? দাঁত কি কথা বলে? শব্দটা কিরকম জান? একটা রূপের পর রূপ যেমন, সেইরকম রূপেতেই আছে, গতিতেই আছে। মুখে "আ" বলতে, "উ" বলতে বা "ক" বলতে এই যে জিহ্বাটা রকমারি করতে হয়, এই বিভিন্ন পরিবর্তনই হচ্ছে শব্দ। এইটাই চলছে জগতে। আরামে, দুঃখে মুখের পরিবর্তনে যেমন বিভিন্ন চেহারা হয়, তেমনি ইংরেজ, জাপানীর বিভিন্ন ভাষা; চীনে ভাষায় আবার চ্যাং চুং করলো; এই দুনিয়ার একশো লক্ষ ভাষাকে এই জিহ্বা দিয়ে চালানো যায়। শুধু যে মুখে কথা বলা যায় তা নয়, চোখও কথা বলতে পারে। চোখ দিয়ে শব্দ করে। কথা বলতে না পারলেও চোখ হাসে, কাঁদে। চোখ দেখিয়ে হাসানো যায়। চোখ দেখিয়ে বিদায় করা যায়, কাঁদিয়ে দেওয়া যায়। মাষ্টার মশায় এমন একখানা চোখ দেখালেন তাতেই ব্যাস্। আবার এই চোখ ঘুরিয়ে সার্কাসে বিড়াল, কুকুরকে আগুনের ভিতর লাফিয়ে যেতে বলা হয়। এই যে চোখের গতি প্রত্যেকের ভিতরে বিভিন্নভাবে চলছে, তা দেখে বলা যায় যে, সে সুখী না দুঃখী, রাগী না হাসিখুশী সব বুঝা যায়। এই যে গতিগুলি এইগুলি শব্দের বিভিন্ন রূপ। যেমন, একজনের বাবা আছেন। আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাবাকে আমি পিসেমশাই বলি। তিনি একজনের দাদা, একজনের জ্যাঠামশায়, কারও খুড়োমশায়, কারও শালা-সম্বন্ধি; যে তাকে যে নামে ডাকে, সে তাকে তেমন ভাবেই দেখে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এক বাবার কত নাম। তিনি কিন্তু, একটা রূপেই আছেন। কিন্তু বিভিন্ন সম্পর্কে আছেন বলেই নানা

নামে ডাকে। তবুও জ্যেঠা মহাশয়, জ্যেঠা মহাশয়ই থাকে। আবার যে বেয়াই ডাকে, সে বেয়াই রূপেই দেখে। বেয়াই, শ্বশুর শব্দ বিভিন্নরূপ, ব্যক্তি একজন। একজনই বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যায়। শব্দটা বলছে, একটা শব্দ নয়। এই শব্দেরই বহু রূপ বিশ্বরূপ, বিভিন্ন ভাবে পরিচিত বা প্রকাশ।

একটা পদ্মের রূপ আর গোলাপের রূপ এক নয়। একটা তত্ত্বেরই বিভিন্ন বিকাশ। বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিভক্ত হয়ে একটা রূপেরই প্রকাশ করছে শব্দ। তাহলে শব্দের অগণিত রূপ। একটা কথা থেকে যাচ্ছে। রকমারি শব্দ যেটা নানা শব্দ, নিজে স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্নরূপে আবার বিভিন্নভাবে একটা রূপেরই প্রকাশ করছে। একটা লোক তার এইটা পা, এইটা চক্ষু, এইটা হাত এটা কান, ভাগাভাগি করে টুকরো টুকরো করে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা টুকরো, এক একটা পাত্রেতে রেখে দিল। তখন তো কইবে না অমুক মশাই। দেখা যাচ্ছে, নখ, কান, চুল, ঠ্যাং পড়ে আছে, লোকটার নাম আর বলা হল না। বিভক্ত করে দেখলে পাঁচশো টুকরো হয়ে গেল। (ধর, নির্মাল্য), তত্ত্বও তেমনি। একটা শব্দেরই একটা শক্তিরই এত ভাগ হয়ে গেছে। আবার সেই ব্যক্তির বিভিন্ন অংশকে জোড়া দিয়ে একটা আঙ্গুল স্পর্শ করলেও তাকেই স্পর্শ করা হল। এক মাইল লম্বা হয়ে যদি শুয়ে থাকে ঐ লোকটা, তার যে জায়গায়ই স্পর্শ কর, তাকেই যে স্পর্শ করা হচ্ছে, তা সে বুঝতে পারে। আমরা যা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি বা স্পর্শ করছি, তাতে বিশ্ব বিরাটকেই স্পর্শ করা হচ্ছে; শুধু চিন্তার সূত্রে যোগাযোগের সুরে যুক্ত হয়ে থাকা চাই। সমুদ্রের যেখানে স্পর্শ কর, তাতেই সমস্ত সমুদ্রকে স্পর্শ করা হয়ে যায়। পুরী বা লন্ডনে গিয়ে সেখানকার সাগরের জল স্পর্শ করতে হয় না। সেইরূপ যে কোন শব্দের দ্বারা একটা শক্তিকেই স্পর্শ করা হচ্ছে। এই ভাবটা যদি বুঝে নেওয়া যায়, তা হলেই হয়ে গেল।

> আমরা যা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি বা স্পর্শ করছি, তাতে বিশ্ব বিরাটকেই স্পর্শ করা হচ্ছে; শুধু চিন্তার সূত্রে যোগাযোগের সুরে যুক্ত হয়ে থাকা চাই।

একটা গল্প আছে। একজন পাহাড়ে বসে আছে। একটা থাম্বার

(গড়িয়ে রাখা একটা থামের ওপরে) উপরে বসে আছে। দিব্যি বসে তামাক খাচ্ছে গুড় গুড় করে। খানিক পরে থাম্বাটা নড়ে উঠেছে। নড়লো কেন? তাহলে এটা কি? সেইটা দেখতে দেখতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে দেখে, এক বিরাট সর্প মুখ হাঁ করে শুয়ে আছে। আগে বুঝতে পারেনি।

আমরাও থাম্বার উপরে বসে আছি, বললে ভুল হবে না। আমাদের ভিতরেও কুলকুন্ডলিনী আছে — সর্পাকারে প্যাঁচ দিয়ে রয়েছে। এই যে কুলকুন্ডলিনী যাহাকে বলা হয়েছে, ইহাই জ্ঞান সর্প। আমরা এঁকে ধরতে পারছি না। এই যে ফুল ধরে আছি, আমরা যে জিনিসটা ধরছি, সেইটাই ধরে আছি। শব্দকে যে আমরা ধরে আছি, তা আমরা বুঝতে পারি না। অথচ শব্দ দিয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছি। তত্ত্বটা বুঝতে হবে। খেজুর গাছ দেখেছো? কাঁটা ভর্ত্তি; ভাল লাগে না। কিন্তু চাইছা (চেঁছে) টাইছা দিলে তো সুমিষ্ট রস বের হতে পারে, সেটা জানা নাই। কাজেই 'ভাল লাগে না,' এই না বুঝার হোঁচট খাচ্ছি, খোঁচা খাচ্ছি প্রতিমুহূর্ত্তে। এই হোঁচট খাওয়া, খোঁচা খাওয়া, না বুঝার একটা কাঁটা সবসময় আমাদের বিঁধছে। মনে হয় যেন কন্টক বনে পড়ে গেছি। অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা এই জগৎটাকে দেখছি অন্ধকারময়রূপে। না জানার একটা কাঁটা সবসময় আমাদের বিঁধছে। কি হবে? কেমন করে হবে? এই যে হাজার অবস্থা, এইটাই আমাদের কাঁটা বন। একটা জিনিস একেকভাবে আসে। শব্দটা যখন স্মরণে আসবে, তখন এক অবস্থা। আবার আসবে ভাবলেই তাকে তাড়াতাড়ি বহাল করে নেওয়া যায় না। এই কাঠটায় একটা বাড়ি দিলে শব্দ হয়। যে জিনিসটায় ঘা দিলে শব্দ হয়, সেই জিনিসটা স্বয়ং শব্দ। শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত আছে বলেই শব্দ হয়। যে জিনিস স্পর্শ করলে তা বুঝতে পারা যায়, সেটাই শব্দ। আবার হাতে স্পর্শ করা ছাড়া অন্যভাবেও বুঝা যায়।

> আমরাও থাম্বার উপরে বসে আছি, বললে ভুল হবে না। আমাদের ভিতরেও কুলকুন্ডলিনী আছে-সর্পাকারে প্যাঁচ দিয়ে রয়েছে। এই যে কুলকুন্ডলিনী যাহাকে বলা হয়েছে, ইহাই জ্ঞান সর্প।

এই যে ফুলটা দেখলে, দেহের অভ্যন্তরে কত দ্রুতগতিতে যে এই

দেখা ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হলো, বুঝা যায় না। আমরা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ফুলটি দেখলাম। আমাদের ভিতরে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা আছে যে, তা দিয়ে এই পৃথিবীকে ৯ প্যাঁচে প্যাঁচানো যায়। পৃথিবী যদি ২৫ হাজার মাইল হয়, তবে ফুলটি দেখার মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের মধ্যে তুমি ৯ বার ২৫ হাজার মাইল, অর্থাৎ ২,২৫,০০০ মাইল ঘুরে আসলে এবং ফুলটি দেখতে সক্ষম হলে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে না? দেহের অভ্যন্তরে কত যে আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, যতই ভাববে, আশ্চর্যের পর আশ্চর্যই হয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখান থেকে Esplanade যেতে ঠ্যাং ব্যথা হয়ে যায়। আর ২,২৫,০০০ মাইল যেতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয়, এই ফুলটা দেখতেও সেই পরিশ্রম হল। দেহের শিরা উপশিরাগুলি ঘুরতে ২২,২০,০০০ মাইল ঘুরে যেতে হয়। কিন্তু আমাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে বলে আমরা বুঝতে পারি না। তোমরা যে এখন দেখছো, শুনছো, কথা বলছো, এই এত এত মাইল ঘুরে (২,২৫,০০০ মাইল) তারপর সাড়া দিলে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই চলেছে এই দ্রুততম গতির ধারা। রক্তের ভিতরে যেমন কণিকা থাকে, তেমনি সৃষ্টির বীজ এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুতে আছে বা কণিকায় আছে, যাকে অনুবীক্ষণেও পাওয়া যায় না। বালি এত সূক্ষ্ম কিন্তু সৃষ্টির সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু ওজনের পর আরও সূক্ষ্ম কণিকা আছে, যা খুঁজে পাওয়া যায় না, খুঁজে বের করা যায় না। কিন্তু তারও সত্তা আছে, চৈতন্য আছে। যে যন্ত্রে একটা বালুকণাকে ১০০ হাত লম্বা ও ৫০ হাত চওড়া দেখায়, সেই যন্ত্র দিয়েও ঐ সূক্ষ্ম কণিকাগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে এই যন্ত্রের তুলনায় সেই কণিকা কতটুকু হবে? এই কণিকার কাছে একটা বালুকণা একটা ছোট পাহাড়। তাই দেহের কণিকা এত সূক্ষ্ম যে, চিন্তা করা যায় না। এটা Science-এর জ্ঞান দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে। এই দেহের সাথে

আমাদের ভিতরে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা আছে যে, তা দিয়ে এই পৃথিবীকে ৯ প্যাঁচে প্যাঁচানো যায়। পৃথিবী যদি ২৫ হাজার মাইল হয়, তবে ফুলটি দেখার মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের মধ্যে তুমি ৯ বার ২৫ হাজার মাইল, অর্থাৎ ২,২৫,০০০ মাইল ঘুরে আসলে

রক্তের ভিতরে যেমন কণিকা থাকে, তেমনি সৃষ্টির বীজ এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুতে আছে বা কণিকায় আছে, যাকে অনুবীক্ষণেও পাওয়া যায় না।

কণিকার কোন তুলনা হয় না। এই কণিকাই আবার প্রত্যেকের দেহে আছে। এই ফুলটা যখন দেখছো, কণিকা দিয়ে, শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে চোখের দৃষ্টি ফুলের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি ঘুরে এসে প্রকাশ করলো এটা পদ্ম ফুল। এই দেহ হতে ঐ কণিকা পর্যন্ত অজস্র লাইন আছে।

অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের মিলিত সাড়াই মন। 'ভূ র্ভুবঃ স্বঃ' সেই মনের ক্ষমতা অপরিসীম। এই সমস্ত বিশ্বে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, অনন্তলোকে মন পরিব্যাপ্ত। সেই অনন্তলোকের অনন্তরূপ, যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে প্রতিটি কণিকাতে রয়েছে সেই সমস্ত রূপ। সেই অনন্ত বিশ্বে অগণিত সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী রয়ে গেছে অনন্ত শূন্যে। সেই রূপকে ধরে ধরে যদি চলে যাই অনন্ত মহাশূন্যের পথে চলতেই থাকবো। অনন্ত রূপকে ধরার পক্ষে একটা রূপই যথেষ্ট। এটাই যোগ। যে নিয়মাবলীর ভিতর দিয়ে যে গতিতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই গতির সঙ্গে আমাদের গতিকে কিভাবে এক গতি করা যায়, সেই অভ্যাসটাই হচ্ছে যোগ। তারজন্যই বেদ বেদান্ত উপনিষদ। সুতরাং আমরা সেই যোগ অভ্যাস করবো। সেই গতিটা যদি আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। শুধু মুখের কথায় হবে না। আমি এমনভাবে সাধবো, এমন বন্দনায় বাঁধতে হবে যাতে চিরতরে যোগাযোগের সুরে যুক্ত হওয়া যায়। দেখতে হবে, যে বস্তুটাকে ভাববো, সেই জিনিসটা কার উপরে নির্ভরশীল। অনন্ত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ শূন্যে আপনমনে নিজস্ব কক্ষে থেকে ঘূর্ণীপাকে ঘুরছে। বছরের পর বছর সে (সূর্য) তার গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যে যার নিজস্ব সত্তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের উদ্ভব যখন তার থেকেই হয়েছে, আমাদের চিন্তাধারাও সেভাবেই থাকবে।

যে নিয়মাবলীর ভিতর দিয়ে যে গতিতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই গতির সঙ্গে আমাদের গতির কিভাবে এক গতি করা যায়, সেই অভ্যাসটাই হচ্ছে যোগ। তারজন্যই বেদ বেদান্ত উপনিষদ।

এই অনন্ত সৃষ্টি কার্য চলেছে প্রকৃতি পুরুষের মিলনে। সূর্য শূন্যে থেকে আপন সাধনায় রত আছে। আমরা যদি বিরাট শূন্যে মনকে ছেড়ে

সাগরে চলছে জাহাজ। জাহাজের উপরের লোকজন যেমন ভুলে যায়, জলে আছে। তাদের মনে হয়, স্থলেই বুঝি আছে। কিন্তু যত খেলাই খেলুক, জাহাজ সাগরে ভাসছে। ঠিক তেমনই আমরা যতই মায়া, মোহ, কামের কথা বলি, আমরা সেই শূন্যের ভিতর থেকেই বলছি।

দিয়ে বসে থাকি, আমরাও সেই গতির সঙ্গে এগিয়ে যাবো। আমরাও সেই গতির সাথে একগতি করতে পারবো। যেই গতি অনন্তধারায় অনর্গল বয়ে চলেছে, যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অগণিত জীবলোক, আমরা সেই বোলে বোল দেব। আমরা সেই বোলে বলীয়ান হবো। অনন্ত বিশ্বের গতির সাথে যাতে একগতি হয়ে যেতে পারি, তারজন্য সাধনা করবো। সেই সুরকে, সেই গতিকে আয়ত্ত করতে পারলেই একগতি হয়ে যাবে। এই মহাশূন্যে যদি মনকে রাখা যায়, তবেই পাব সেই ব্যাপকতার সুর। তবুও আসবে ভাবনায় কি করে মনকে মহাশূন্যে রাখা যায়? কি ভাবে তাহা সম্ভব, তাহাই দেখতে হবে। সাগরে চলছে জাহাজ। জাহাজের উপরের লোকজন যেমন ভুলে যায়, জলে আছে। তাদের মনে হয়, স্থলেই বুঝি আছে। কিন্তু যত খেলাই খেলুক, জাহাজ সাগরে ভাসছে। ঠিক তেমনই আমরা যতই মায়া, মোহ, কামের কথা বলি, আমরা সেই শূন্যের ভিতর থেকেই বলছি। বৃত্তির নিবৃত্তির সব খেলা, আমাদের এই খেলনার খেলা সবটাই শূন্যের উপরে চলছে। আমরা যাহা কিছু করি, সব শূন্যের প্রভাবে শূন্যকে পূরণ করার জন্যই করি। তাই শূন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের এই সব খেলা প্রকারান্তরে শূন্যেরই খেলা। সেই গতিটার যে উদ্ভব, আবার যে মিশে যাওয়া, তারজন্য যে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির নিবৃত্তির কথা বলছে, ইহা গতিরই একটা স্ফূরণ। বর্ষার জল যেমন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় মহাসাগরে, সেইরূপ বিরাটের পথে সব টেনে নিয়ে যায় মন। বিরাট গতির দিকে কাম ক্রোধ প্রভৃতির গতির ধারা বর্ষার জলের মত টেনে নিয়ে যায়। নিদাঘের রাগে সূর্যের প্রখর উত্তাপে খালের জল, বিলের জল থাকে না, সব টেনে নিয়ে যায় মহাশূন্যে। এই জলকে সূর্য একদিকে টানে, বাতাস, একদিকে টানে, সাগর একদিকে টানে, আবার টানে পৃথিবীর ভূগর্ভ হতে। যখন বুঝবো, সব টান একটানেরই টান, এক মহাসুরের সুর, একগতিরই খেলা, তখনই মন নিবিষ্ট হবে মহাশূন্যে। অনন্ত বিশ্বের সব টানাটানির টান; সার হলো সব টানের ভিতর এক টানেরই খেলা।

সূর্যের উত্তাপে জলকে টেনে নিয়ে যায় যেমন, ঠিক তেমনই কুয়াশার শিশির বিন্দুর মত আমাদের মন কণিকায় কণিকায় শূন্যের সঙ্গে একত্ব হতে চায়। এমন একটা দিন আসবে যখন মিশবার আগ্রহে সমস্ত কণিকাগুলো মিশতে চাইবে; মিশবার জন্য সমস্ত কণিকাগুলো এক হয়ে যাবে।

বহুমুখীর খেলার মাঝে এক মুখীরই খেলা। বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন প্রকাশে অন্তর্নিহিত আছে একেরেই কথা। এই একক বুদ্ধি, একত্বের বুদ্ধি গভীরভাবে নিবদ্ধ থাকে। বিভিন্ন বুদ্ধি যখন এক বুদ্ধি হয়, এই যে যোগাযোগ, তারজন্যই যোগ। মনটা কি করে? সূর্যের উত্তাপে জলকে টেনে নিয়ে যায় যেমন, ঠিক তেমনই কুয়াশার শিশির বিন্দুর মত আমাদের মন কণিকায় কণিকায় শূন্যের সঙ্গে একত্ব হতে চায়। এমন একটা দিন আসবে যখন মিশবার আগ্রহে সমস্ত কণিকাগুলো মিশতে চাইবে; মিশবার জন্য সমস্ত কণিকাগুলো এক হয়ে যাবে। বর্ষায় খালগুলো ডুবতে লাগলো, বাড়ীর উপর জল উঠতে লাগলো, ক্ষেত ডুবে গেল। আমাদের মন প্রবল বন্যার মত সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

যখন অনন্ত সাগরে লীন হয়ে যাবে চৈতন্যময়ের চৈতন্য তখনই সব জানতে পারবে। তখনই সব সমাধান হয়ে যাবে। তুমিও যে সেই এক সত্তায় আছ, তুমি আর বিশ্বের সত্ত যে একই সত্তা তখন বুঝতে পারবে।

তখন তুমি কি দেখবে? নদী থেকে (আজ্ঞা চক্র থেকে) ফুল ফুটতে ফুটতে সাগরে (সহস্রার) এসে গেছে। মাছ বোঝে না, মাছ জানে না, সে সাগরে আছে। সেরকম আমরাও বুঝি না যে, আমরা শূন্যের সাগরে আছি। সহস্রারে সহস্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। কুলকুন্ডলিনীর ফণা ধরে ধরে আমরা সেই সহস্রারে উঠবো, সহস্র সূর্যের কিরণে আলোকিত হবো। জলের মাঝে সেই মহাপদ্মের (সহস্রারের) বীজ ছিল। মহানালের ন্যায় জেগে উঠলো। সাপের মত ফণা ধরে ভেসে উঠলো। এই যে ফণা বিস্তার করে সহস্রারের সীমান্তে (মহাশূন্যে) এসে দাঁড়িয়েছে। এই যে ধারা আমাদের মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত একটা নাল চলে গেছে। সেই মূলাধার হতে সহস্র ফণা বিস্তার করে মহানাল সহস্রারে উঠেছে। এই মহাশূন্য (আজ্ঞাচক্র) হতে একটি সহস্রদল ভেসে উঠছে আপনমনে। তখন দেখা যায়, সাগরে যতটা জল আছে, বাতাসে তত জল জমে আছে কণিকায় মাত্রাতে মাত্রাতে। আসলে

বাতাসের জল বরফ হয়ে যায়। আমাদের দেহেও জল অজস্র কণিকা হয়ে ভেসে আছে। আমাদের দেহও অজস্র কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। যখন অনন্ত সাগরে লীন হয়ে যাবে চৈতন্যময়ের চৈতন্য তখনই সব জানতে পারবে। তখনই সব সমাধান হয়ে যাবে। তুমিও যে সেই এক সত্তায় আছ, তুমি আর বিশ্বের সত্তা যে একই সত্তা তখন বুঝতে পারবে। এই তত্ত্ব গভীরতার মাঝে অন্তর্নিহিত। অল্প সময়ে বুঝানো যায় না। এই তত্ত্বের নাক, মুখ বের করতে সময় লাগে। যখন গড়বার সময় আসবে, তখন বুঝবে, অদ্ভুত এক জিনিস, অপূর্ব এক জিনিস। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মন্ত্রই সুর মন্ত্রই শব্দ ব্রহ্ম

ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কোলকাতা
১৫-০৪-১৯৬১

পূজা করলেই ভগবান পাওয়া যায় না। রান্নার খেলাঘর ততদিনই থাকে, যতক্ষণ রান্না না শেখে। মন্ত্রই সুর, মন্ত্রই শব্দ ব্রহ্ম। যে সুরকে অবলম্বন করে জগতের সুরকে আয়ত্ত করা যায়, সেটাই মন্ত্র। তুমি মন্দিরে গীর্জায় মসজিদে যাও, আপত্তি নেই। সকলের সঙ্গে সহযোগিতা কর, আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার মধু তুমি আহরণ করে সংগ্রহ করে নাও। মূর্ত্তি, বিগ্রহ ইত্যাদির পূজা কেবলমাত্র সাধনার অঙ্গ নয়।

> তুমি মন্দিরে গীর্জায় মসজিদে যাও, আপত্তি নেই। সকলের সঙ্গে সহযোগিতা কর, আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার মধু তুমি আহরণ করে সংগ্রহ করে নাও।

তুমি সূর্যের তেজের সাধনা করবে, আপনি জেগে উঠবে। এখানে তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মের যে নিয়মাবলী আছে, তাতে পড়লেই তুমি পাকে পড়ে যাবে। তাতেই হবে ফাঁক। একঘর টাকা যদি চেকে দিয়ে দেয়, তবে সবদিকেই সুবিধা। এই মন্ত্র হচ্ছে চেক। তোমার ধর্ম, তোমার নীতি ব্যাপকতার সুরে ভরা। তোমার ধর্ম জীব ধর্ম। এই অনন্ত বিশ্বে সমস্ত জীবের যে ধর্ম, সেটাই তোমার ধর্ম। একটি পিপীলিকাও তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম সকলের জন্য।

> আমরা পরাধীনতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি। নূতন মত, অভিনব দর্শন স্থাপন করতে হবে, যাতে সব পরিবর্ত্তন হবে।

এক সূর্য, এক জল, এক মাটি এক বাতাস, ধর্মও এক। মানুষ জাত, এক জাত, জীবজাত একজাত। পৃথিবীর বুকের উপর আমরা আছি। প্রকৃতির নীতিগুলি, নিয়মগুলি জেনে নেবে। এপথে চলতে গেলে বিপ্লব আসবে, ঝড় ঝাপটা আসবে, আসুক। দেশে প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। আমরা পরাধীনতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি। নূতন মত, অভিনব দর্শন স্থাপন করতে হবে, যাতে সব পরিবর্ত্তন হবে।

বেদ কি? মন্ত্র কি? সব বুঝে নেওয়া দরকার। এই যে একেকজন সাধু, মহাপুরুষ আসলো। বেশীরভাগ ইচ্ছামত মত, পথ দিয়ে যাচ্ছে। তা করতে দেওয়া হবে না।

দেশকে ভালবাস, জনগণকে ভালবাস। আমি যে এসেছি, নানাজনে নানাকথা বলতে আরম্ভ করেছে। তারা চাইছে সবকিছু পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায় ভোগ করতে। ওর থেকে, তার থেকে পয়সা নিচ্ছে মন্ত্র দিয়ে। বৃষ্টির জল যখন পড়ে, পয়সা দাও? মন্ত্র হচ্ছে বন্যা। কাকে পয়সা দেবে? আমি যদি রিক্সা টানি, তাতেও আপত্তি নেই। এই যে যা খুশী তাই করছে, ধর্মের নামে মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে পয়সা আদায় করছে, এতে আমি রাজী নই।

আমি যদি রিক্সা টানি, তাতেও আপত্তি নেই। এই যে যা খুশী তাই করছে, ধর্মের নামে মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে পয়সা আদায় করছে, এতে আমি রাজী নই।

ধরো, একজন গোহত্যা করেছে। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে ৫০০ টাকা খরচ করলো। যে প্রায়শ্চিত্ত করালো (ধর্মব্যবসায়ী) সে বললো, তুমি রেহাই পেয়ে গেছ। সে যে মন্ত্র উচ্চারণ করলো, তার অর্থ "হে জল, বাতাস, তাপ তুমি আমার পাপ নিয়ে যাও। আমার উপর দৃষ্টি রাখ। আমাকে শুদ্ধ কর। আমাকে বুদ্ধ কর। আমাকে মুক্ত কর।" এই হলো সাধারণ অর্থ। এই মন্ত্র সে উচ্চারণ করলো। তারপর তার কপালে একটা ছাইয়ের ফোঁটা দিল। ৫০০ টাকা খরচ করার পর সে লোকটিকে বললো, 'তুমি মুক্ত হয়ে গেছ'। এক একটা কথা বের করার জন্য ৫০০ টাকা খরচ। আর আমি

মাথায় টোকা দিয়ে এক সেকেন্ডে দিয়ে যাচ্ছি। অজস্র ফোঁটা নিয়ে বন্যা হয়। মন্ত্রও ছড়িয়ে দিতে হয় দেশে। মন্ত্র হচ্ছে বৃষ্টি। মন্ত্র হচ্ছে বন্যা। আমি সেকেন্ডটুকু মাত্র সময় নিলাম মন্ত্র দিতে। আর দক্ষিণা হিসাবে তোমাদের গ্রহণ করলাম।

অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আমার পিছনে লেগেছে। আমি লেখাচ্ছিলাম। ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়েছে; বিরাট সাপ। তিনজনে ৮০০ টাকা করে ২,৪০০ টাকা দিয়েছিল এরজন্য। পরে স্বীকার করেছে ও মন্ত্র নিয়েছে। নৌকা ফুটো করে দিয়েছে। তখন আমার ১৩/১৪ বছর বয়স। তারপর লং পাহাড়ে গেছি। সেখানে আমাকে তীর ছুঁড়েছে। বহুজনে আমার বিরুদ্ধে গিয়ে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। শিশুবয়স থেকে একাকী ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি। আজও করছি। তোমরা আমার পাশে থেকো। আমাদের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। আমি ধর্মের নামে ব্যবসা করতে দেব না। কাজেই মার খেতে হবে আমাকে। আজ এই থাক।

শিশুবয়স থেকে একাকী ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি। আজও করছি। তোমরা আমার পাশে থেকো। আমাদের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমাদের মূর্ত্তিগুলি ভগবানকে ডাকার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়নি

০৯-০২-১৯৬১

৪৬নং ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কোলকাতা

চারিদিকে অনেক জায়গায় ভাষণ দিতে হয়েছে। ভীষণ পরিশ্রম হয়েছে। কেমন আছেন? এরকম জাতীয় দু'চারটি কথা। তারপরই শুরু করেছি ভাষণ। নবদ্বীপে বেদ সম্বন্ধে আলাপ করেছিলাম। আমি যদি বেদ সম্বন্ধে বলি, কাঠ খোট্টা হয়ে যাবে। ওখানে নবদ্বীপে পন্ডিতদের যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন বেশ অভিজ্ঞ। তাঁদের (পন্ডিতদের) একটা আভিজাত্য আছে। তারা বুঝেছে যে, শাস্ত্রটা আমি ভালভাবে বুঝেছি। ওরা বলছে, আপনি বাংলা কেন, সারা ভারত তথা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতেন। আপনি আমাদের টেনে নিতে ভুলবেন না। শাস্ত্রসম্বন্ধে আলাপ হয়েছিল তাদের সাথে। মুস্কিল হচ্ছে কি এমনভাবে না বলে অর্থাৎ সত্যটাকে না বলে থাকাটাই অসুবিধার ব্যাপার। শাস্ত্র নিয়ে যে সমস্ত আলাপ হয়েছিল, খুব সহজভাবে বলেছি। এদের ব্যাখ্যা মামুলী। নবদ্বীপ এমন একটি জায়গা যেখানে আমাকে কেহ ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে সাহস পায়নি। তারাই বলেছে, আপনিই পারেন, ধর্ম থেকে আবরণ (কুসংস্কার) সরাতে। Vote-এর

Canvasing-এর ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় আমাকে বলতে হয়েছে। দু'হাজার, তিন হাজার লোকের সামনে বলেছি, কাজ করতে হলে এইভাবে করো। তা না হলে হবে না। কিন্তু আশ্চর্য যা যা বলেছি, সবাই যেন accept করে নিয়েছে। ধর্ম এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ার ফলে যে যার খুশী, যার যা অভিরুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন আগে একটা ঘটনা বলেছিলাম। একব্যক্তি অন্ধকে দুধের রং বুঝাচ্ছে।

অন্ধ — দুধ কি রকম?
উঃ — বকের মত।
অন্ধ — বক কি রকম?
উঃ — কাঁচির মতন (কাস্তের মতন)
অন্ধ — কাঁচি কি রকম?
উঃ — হাতীর শুঁড়ের মতন।

তখন কাছ দিয়ে একটা হাতী যাচ্ছিল। সেই ব্যক্তি অন্ধকে হাতীর কাছে নিয়ে, গেছে। অন্ধ হাতীর শুঁড়টা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'এতদিনে বুঝলাম, দুধটা কিরকম।' আজ শাস্ত্রটা এইরকম হয়ে গেছে।

ধর্মের অর্থ আজ বিকৃত হয়ে গেছে। যতগুলি মূর্ত্তি দেখ, একটি মূর্ত্তিও ভগবানকে ডাকার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়নি। তখন সমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ছিল। একজনের ১০টি বাচ্চা। কার কোন্ বাচ্চা, কোন ঠিক নাই। একজনের ৩টি বাচ্চা, সে নেবে একটা। শাসন করলে শাসন কর্তার বিপদ। কিছুতেই আর ঠিক করতে পারছে না। কারও মায়ের ঠিক নেই, বাপের ঠিক নেই। কোন কিছুরই ঠিক নেই। তখন যাদের একটু বুদ্ধি ছিল, দু'চার জন পন্ডিত (বিচক্ষণ) ব্যক্তি চিন্তা করলেন, কি করা যায়। তারা লক্ষ্য করলেন, রাত্রে গাছের পাতা নড়লে তারা (মানুষেরা) ভয় পায়। তখন ঐ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিরাট এক ভয়ের মূর্ত্তি তৈরী করলেন। আর বললেন, 'দেখ, তোমরা যদি এরূপ কর, এরা তোমাদের শেষ করে দেবে।' প্রত্যেকের ঘরে একটা করে অসুরের মূর্ত্তি তৈরী হল। এরকম করে এক একটি মূর্ত্তির মাধ্যমে আস্তে

আস্তে প্রচার করতে আরম্ভ করলো। এই মূর্ত্তি তখন বিরাট ছিল। তারপর সামাজিক মানুষের আচার আচরণ অনেক ভাল হলো। মূর্ত্তিও ভাল হলো। মূর্ত্তির চেহারাতে সৌম্যভাব দেখা দিল। সমাজের মানুষের চেহারার সাথে সাথে মূর্ত্তিগুলিও সুন্দর হতে লাগলো। ঐ মূর্ত্তি এখন আমাদের দেশে চলেছে। আগে ভয়ে ফলটল কেহ খেত না। মানুষের এমনই বিশ্বাস ছিল যে, ফলটল খেলে মরে যাবে। অথবা কি জানি পাগল হয়ে যাবে। তখন বিচক্ষণেরা মূর্ত্তি তৈয়ারী করে বুঝাতে লাগলেন, 'এই এই মূর্ত্তি এই এই ফল খায়। তোমরাও খাও।' তখন তারা মূর্ত্তির সামনে সেই ফল দিয়ে নিজেরা খেতে শিখলো। এইভাবে আম কাঁঠাল চিনলো, ফুটি, তরমুজ চিনলো। শুধু তাই নয়, শাকপাতা তরিতরকারী এভাবে চিনতে লাগলো এবং খেতেও শিখলো। এখনও তাই। ঘোলাটে জলটা Blotting দিয়ে একটু Filtered করেছে, এই যা পার্থক্য। একটা পূজা উপলক্ষ্যে ঢাকিওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, প্যান্ডেলওয়ালা, আলোকসজ্জা, সবদিকে সবাই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তখন এমনিতে কেহ কোন কিছু শিখতো না। এক পূজাকে কেন্দ্র করে সঙঘবন্ধভাবে সবাই যেত। এইভাবে তাদের মধ্যে Unity (ঐক্য) হয়ে দেশাত্মবোধ একটু আসলো। সমস্ত দিকটা বজায় রাখবার জন্যই পূজা। আমাদের দেশে কিছু কিছু সম্প্রদায়ের বাড়ী আমাদের চেয়ে অপরিষ্কার থাকে। কারণ Hygien বই বা স্বাস্থ্য বই পড়ে তো তারা পরিষ্কার হয় না। ঘরে লক্ষ্মীর পট আছে। এই চিন্তায় বৌমারা শাশুড়ীর ভয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে। কারণ মা লক্ষ্মী কোনদিক দিয়ে আসেন তার ঠিক নেই। তারপর এক এক পূজা এক এক সময়ে। কাজেই ঘরবাড়ী সব পরিষ্কার রাখতে হতো। এটা যদি না হতো, তবে আজ নাহলে কাল করবো, কাল না হলে পরশু করবো, এইভাবে কোন কাজই হতো না। কাজেই পূজা করার মধ্যে একটা Hygienic Cause (স্বাস্থ্যসম্মত কারণ) ছিল।

ধর্মের নামে, ধর্মের অঙ্গহিসাবে এই যে কীর্তন, নগর পরিক্রমা, নাচাটাচা, এসবেরই একটা Helath-এর কারণ ছিল। কে আর ভোরে উঠে

Barble দিয়ে ব্যায়াম করে? বুড়া মানুষকে যদি একটা Barble দাও আর বল, 'ব্যায়াম কর, বৈঠখারি দাও', তাহলে দেবে মুখে একটা চটকানি (চড়) আর বলবে, 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস্?' আর ঘুম থেকে উঠে বাবার সামনে যদি মৃদঙ্গ, করতাল, বাঁশী এগিয়ে দাও, বাবা খুশী মনে কীর্ত্তনীয়া দলের সাথে ৩ মাইল নাচতে গেল। তাতে ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, করোনারী, থ্রম্বসিস্ সব বন্ধ হতো। আর একটি দিকও ছিল। আমাদের দেশে দৈনন্দিন শান্তি বলতে এমন কিছু নেই, যার উপর নির্ভর করে মানুষের সময় কাটবে। কাজেই সবাই মিলে নামগান করা, তাঁর (ভগবানের) উপর সব ভার দিয়ে সবসময় একটা নাম নিয়ে থাকার বেশ উপকারিতা আছে। এর একটা ফল হ'ল, গলার স্বর ভাল হয়। সুরের একটু জ্ঞান হয়। সারাদিন ঐ ভাবটা নিয়ে থাকলে বাড়ীতে অশান্তি কম হয়। স্বামীরা ভালভাবে থাকে সবসময়। কাজেই প্রভুর নাম করে অনেকটা শান্তি। তারপর পূজার ব্যাপারে মাসে মাসে ফল খাওয়া, Season-এর ফল খাওয়া খুব ভাল। বয়স্ক যারা, তাদের সাধারণতঃ ফলটল জোটে না। এই অম্বুবাচিতে সকলের সম্মুখে একটু খেতে পারে। কারণ অন্য সময়ে খেতে পারে না। যে সব ছেলে মাতৃভক্ত, তারাও তো মাকে খাওয়াতে চায়। কাজেই চারদিন প্রকারান্তরে অম্বুবাচিতে তারা ফল খেতে পেল। এই নিয়মগুলি করে করে সমাজ সংসারকে শৃঙ্খলায় আনতে চেষ্টা করলো।

খুচরো খুচরো অনেক ঠাকুর আছেন, যাঁরা বছরে একবার করে আসেন। কাউকে গণেশের মূর্ত্তির রং করতে বলা হোল। এই যে রং-এর কাজ, এরও বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে। কার্ত্তিকের রং, গণেশের রং, এক এক দেবতার এক এক রকম রং। কার্ত্তিকের রং কি সুন্দর। তারও একটা ব্যাখ্যা আছে। এই সমস্ত রং-এর কারিকুরি, মূর্ত্তির মধ্যে যে রং দেওয়া, এর মধ্যে একটা Art আছে। সরস্বতীর রং শুভ্র, জ্ঞানটাও শুভ্র। তার স্বচ্ছ টলটলে ভাব। সরস্বতী মূর্ত্তির মাধ্যমে আমরা কার উপাসনা করছি? সেই স্বচ্ছতা বা সেই শুভ্রতার উপাসনা করছি। মূর্ত্তিটা তৈরী করে উপাসনা করছি এর প্রতীক হিসাবে। প্রকৃতি থেকে সেই স্বচ্ছ, শুভ্র, ধবল ভাব এনে আমরা যাতে বলীয়ান হতে পারি, তারজন্যই সরস্বতী পূজা করছি। সেই স্বচ্ছের

যে সুর এবং স্বচ্ছের যে ভাব, সেটা কোথায় আনবো? তা আমাদের কণ্ঠে আনবো। সেই মূর্ত্তি সরস্বতীর তলায় রয়েছে হংস, পরমহংস। আমরা নিজস্ব আত্মার সাথে যাতে মিলতে পারি, আমাদের সত্তা যাতে পরমাত্মার সঙ্গে মিশতে পারে, সেইজন্যই হংস। বাহনটি চমৎকার। তার অর্থ বিরাট। কিন্তু গণেশের বাহন ছুঁচো। সেটা যেন কেমন। তবে ছুঁচোটা কেন দিয়েছে? তার Sharp (তীক্ষ্ণ) দাঁত, Sharp ভাবে কাটেও, বুদ্ধিও সেইরূপ Sharp, কাজেই ওর পূজা করে। ওতে যিনি বসে আছেন, তিনিও (গণেশ) Sharp. তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী তিনি। তাঁর পূজাটাও আগে। তাঁর বাহনটিও কম ওস্তাদ নয়। যেটা বললাম, এ অবস্থায় কেহ চিন্তা করে না। তারা ভাবে লক্ষ্মী ঠিকই ঘুরছে। কোন্‌দিক দিয়ে যে আসে, তার ঠিক নেই।

দেশে একবার লঞ্চে যাচ্ছি। তিন নদীর মোহনায় এমন ঢেউ উঠেছে যে, জল লঞ্চের এদিক দিয়ে উঠে ওদিক দিয়ে যাচ্ছে। মাসিমা কতগুলি ডালের বড়ি দিয়েছিলেন এবং পকেটে যে কখন নীলের প্যাকেট দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না। কাপড় তো সবারই ভিজেছে। আমার কাপড়টা নীলের রূপ নিয়েছে। আমার জামা ভিজে যে চেহারা হয়েছে, পাশের লোকটিকে বলি, 'ও মশাই, কি লাগিয়েছেন?' পরে বুঝলাম, মাসীমা নীলের প্যাকেট দিয়েছেন। এমন ঢেউ প্রত্যেকের বুকে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে। এরকম হলে নিজেরটা নিজে শোনে। এখন অন্যেরটাও শুনছে। প্রত্যেকেরই বুক দুরুদুরু করছে। যার গায়ে যা ছিল, সব সুন্দর সুন্দর জিনিস, নিশ্চিন্ত মনে ফেলে দিচ্ছে। সবার বৈরাগ্য এসে গেছে। কারও কোন দ্রব্যের উপর মায়া নাই। কারণ শেষে এইগুলো যেন কোন প্রতিবন্ধক না হয়। কিছুক্ষণ বাদে বিপদঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছে। তখন কি অবস্থা বুঝছেন তো?

আমি বললাম, 'সামনে আমার ডালের বড়ি আছে। একটু দেখুন তো' আছে কি নেই।

প্রশ্নঃ আপনি কি বলছেন? আপনি তো ভীষণ লোক। মানুষ না কি?

আমিঃ দেখুন, শাস্ত্রে আছে শেষ সময়ের চিন্তা বড় সাংঘাতিক।

এরজন্য না আবার জন্ম নিতে হয়।

এদিকে ১৫০ জনের ৪০০ দেবদেবতার নাম নেওয়া হয়ে গেছে। ২/৪ জন আবার কানে আঙুল দিয়ে নমাজ পড়তে আরম্ভ করেছে। আমায় বলছে, আপনি নাম টাম করবেন না? এই অবস্থা লঞ্চের।

আমিঃ এক কার্ত্তিককে দুইজনে দুই মনে ডাকলে অসুবিধা হয়; কার্ত্তিক কোন্‌দিক দিয়ে যাবে। আপনারা ডাকেন, আমি শুনি।

প্রশ্নঃ ডাকেন না কেন?

এরমধ্যে দুইজন দেখি, প্রণাম করলো। পরে বলে 'বাবা রক্ষা করে দেন।'

যাই হোক কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেছে। সব সন্ন্যাসী হয়ে গেছিল। কাপড় জামা নামাতে আরম্ভ করেছিল। তারপর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে পোটলা নিয়ে টানাটানি। দেশলাইয়ের কাঠি আর জ্বলে না। তারপর ইঞ্জিনের গায়ে দিয়ে গরম করে দেশলাই জ্বালায়। সেটা ১৩৩৬ সনের কথা। গাছটা মাথায় না পড়ে কাঁধে পড়েছে। তবু কিছু হয়নি। 'হে ঠাকুর, তুমিই পার এই প্রবল দুর্যোগের মধ্যে ডালের বড়ির কথা বলতে।'

দেখ, শুধু উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঠেকায় পড়লে সব এক হয়ে যায়। তোমাদের ঘরে একনীতি, বাইরে একনীতি। আমার নীতি জলে থাকলে, বাইরে থাকলে, ভিতরে থাকলে একই নীতি।

'জানি বাবা,' ব'লে বাড়ীতে প্রণাম করলো। মনের দুর্বলতার জন্য বাইরে দেখাতে পারে না। তত্ত্ব এর জন্য বললামই না।

আর একবার দেশের বাড়ীতে ভক্তরা আমাকে এক জায়গায় নিয়ে গেছে। আমার তখন ১৩ বৎসর বয়স। আমাকে বলে, 'প্রভু তোমার যেতে হবে।' কোনমতে আমাকে ওখানে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। দেখি, চার পাঁচশো লোক সমবেত হয়েছে। চমৎকার গীতাপাঠ করছেন। ভাল ভাল লোক এসেছেন। নিজেরাও কাঁদছেন, অন্যরাও কাঁদছে। ২/৩ জন পাঠ করার পর

আমাকে পাঠ করতে বলে। আমি তো গীতাপাঠ করি না। আমি ওদেরই পাঠ করতে বলি, 'আপনাদেরটা তো শুনছি।' তাড়াতাড়ি আমার কাছে বইটা এনে আসন দিয়ে বসিয়েছে। আর একাট কাঠের 'দ' (বই রাখার জায়গা) এনে দিয়েছে। আমি গীতার দিকে একবার চাই আর শিষ্যের দিকে চাই। শিষ্যেরা হাসতে আরম্ভ করেছে। বয়স আমার ১৩ বৎসর।

আমি বলি, গীতা কত বড়। গীতার মধ্যে আপনারা যেসব বললেন, তাতে কৃষ্ণকে একবার ভাবে, একবার অভাবে রেখেছে। আর মেয়েরা কাঁদছে। গীতার চেয়ে কান্নার রোল বেশী হয়ে গেছে। কারোর স্বামী মারা গেছে। কারোর ছেলে মারা গেছে। কাজেই দুঃখের সঙ্গে কান্না মিশিয়ে মিশিয়ে কাঁদছে আর ভগবান কৃষ্ণ কান্নার সাথে সাথে এরকম উঠানামা করছে। শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে দুঃখ আর শোকের মধ্যে রেখে নাড়াচাড়া করছে। কৃষ্ণ তো কখনও সুখ দুঃখের মধ্যে থাকেননি। কৃষ্ণের তো কোন রং নেই। রং গেল কই? বহুদূর থেকে নীলাভ মনে হয়। আকাশ দেখতে নীল। আকাশের কি রং আছে? বহুদূর ফাঁকাতে তাকালে যেন নীলাভ রং দেখা যায়। আকাশের যেমন স্থান নেই, সীমানা নেই; কৃষ্ণেরও সীমানা নেই। তাঁকে কখন রাধার বিরহে ফেলেছে। আবার কখনও নারদের সাথে কথোপকথনে (কথাবার্তায়) জড়িয়ে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফেললে অসুবিধা হবে। কৃষ্ণের অবস্থাকে যদি আকাশ চিন্তায় ফেলতেন, তবে অসুবিধা হতো না।

প্রশ্নঃ তবে কি কৃষ্ণ ছিল না?

আমিঃ কৃষ্ণ হচ্ছে আকাশ। আর এই উপগ্রহগুলি বিন্দু বিন্দু (মুখে জল নিয়ে ফুৎ করে ফেললে, যেমন হয়) জলকণার মতন। পৃথিবীর তুলনায় ধুলিকণা যেমন নগণ্য, আকাশের তুলনায় এই পৃথিবীও সেইরকম। যার শেষ নেই, সীমানা নেই, তারই নীলাভ রং। এটাই কৃষ্ণ। গীতা যিনি পাঠ করলেন, তিনিই হয়ে যান গীতা। গীতাপাঠ করতে হলেই ত্যাগী হতে হয়। একটা কথা আছে, আপনিও ত্যাগী। আপনি আজ আছেন। আবার দেহটা ফেলে চলে যাবেন, আপনি এমন ত্যাগী। টাকা না হয় ২/৪টা পাবেন। কিন্তু দেহ ছেড়ে চলে গেলে আর রইল কি? কিছুই তো রইলো না। কাজেই

যে ব্যক্তি গীতা হতে পারে, সে তো চরম ত্যাগী। আপনারা মনে করেন, কাপড়টা ছেড়ে ফেলে বনে চলে গেলেই ত্যাগী হয়ে যাওয়া যায়? ত্যাগের মনোবৃত্তি নিয়ে যদি গীতা পাঠ করে, তবেই সে ত্যাগী হয়। যতই আমরা ভোগ করি না কেন, দেহ তো ফেলে যেতে হচ্ছে। দেহ যখন নানারূপে চলে যায়, তাতেই ত্যাগের বস্তু ভাসতে থাকে। দেহ মিশে গেলে আকাশময় হয়ে থাকে। আর মনটা কে? যিনি ত্যাগী, যিনি পাঠ করছেন, তিনিই মন। কৃষ্ণ মন (কৃষ্ণের মন) হচ্ছে ত্যাগী অর্জুন। আর আকাশ হলো কৃষ্ণ। মনই মনন করবেন। আকাশের ভিতর মনন করলেই আকাশ উত্তর দেবে। কৃষ্ণ উবাচ অর্থ আকাশ বলছেন, সূর্য আমার, চন্দ্র আমার। আমি সর্বত্র। আবার আমাকে খুঁজলে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে বস্তু আছে, সেই বস্তুর বস্তুত্বের মাঝে লক্ষ্য করলেই আমাকে (কৃষ্ণকে) পাবে। তুমি পৃথিবীটুকু যদি মনন করো, তাহলে আমাকে খুঁজে পাবে। আকাশ (কৃষ্ণ) বলছে, আমি সূর্য হয়ে আছি, পৃথিবী হয়ে আছি। আবার তোমার মন হয়ে আছি। আবার তোমায় অর্জুন (মনরূপ) বলছি। কারণ আমি আমাকে যাতে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি, ভালভাবে উপভোগ করতে পারি, তারজন্যই তুমি (অর্জুন) একাধারে ত্যাগী, একাধারে মন।

কৃষ্ণ বলছে, হে মন তুমি যদি আমার মধ্যে থাক, তবে তুমি আর আমি এক হয়ে যাব। হে মন, তুমি আমার কথা স্মরণ করো। তাহলে দুই-এর সমন্বয়ে এক হয়ে যাব। আমি যে তোমার মধ্যে আছি, তুমি যে আমার মধ্যে আছ, তা ভাববে। তবুও হে অর্জুন তুমি ভুল করো না। কারণ তোমার হাতে লাঠি আছে বলে ওস্তাদ হয়ে গেছ, মনে করো না। খালি মন্ত্র থাকবে আর মন থাকবে। তুমি আছ আমার জন্য; তুমি আমার হয়ে আছ, একথা ভাববে। তবেই তুমি আমাকে পাবে। সেই গীতা পাঠ করলেই ভালভাবে অবগত হবে। আর সেই গীতাই আজ উবাচ।

যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এমন গীতাপাঠ তো শোনেননি। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন এবং পরে অনেকেই আমার কাছে এসেছিলেন। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

স্রষ্টার সৃষ্ট জীবই ভগবান

ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ

২৫শে আগষ্ট, ১৯৫৭, সময় ঃ বিকাল - ৫-২৫মিঃ

কোন একসময় ১১টা পৃথিবীর মহানরা একত্রিত হয়েছেন কোন এক পাহাড়ের নিরিবিলি জায়গায়। সেইসব পৃথিবীর মহাপুরুষরা সব একজায়গায় একত্রিত হয়েছেন। মহাপুরুষদের মধ্যে একটা পরীক্ষা হবে এবং সেখানে তাদের চেয়ে যাঁরা বড় ছিলেন, তারা সেই পরীক্ষার খাতা দেখবেন। বহু মহাপুরুষ বসে আছেন সেই নিরিবিলি জায়গায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় সেই দুর্গম স্থানে। তাঁদের চাইতে আরও উপরে যাঁরা যাঁরা ছিলেন তাঁরাও আছেন সেখানে। এক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আছে তো। বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে একটা জায়গায় একত্রিত হয়েছেন। তাঁদের ভাষাও বিভিন্ন। এক ভাষা সকলের নয়। তাঁদের ভিতর যিনি প্রথম হবেন, তিনি একটা উপযুক্ত স্থান (post) পাবেন। যেমন, গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি। যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন, সেই স্থানের বিবরণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকৃতি হতে। তোমরা লড়াই করতে পার, ইহা জানিয়ে দিয়েছে। এখনকার মত 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার' পত্রিকা না থাকলেও বাতাসে ভাসিয়ে ভাসিয়ে বার্ত্তা বহুদূর চলে গেছে। প্রত্যেকেই জানতে

মহাপুরুষদের মধ্যে একটা পরীক্ষা হবে এবং সেখানে তাদের চেয়ে যাঁরা বড় ছিলেন, তারা সেই পরীক্ষার খাতা দেখবেন। বহু মহাপুরুষ বসে আছেন সেই নিরিবিলি জায়গায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় সেই দুর্গম স্থানে।

পেরেছে। সব একত্র পরীক্ষা নিচ্ছেন। ঠিক হল ২/৩ জন পরীক্ষা নেবেন। এই পরীক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সবাই।

এমন পরীক্ষা তো তখন হোতই। সমস্ত পৃথিবীতেই এরকম এরকম পরীক্ষা হোত। সবাই বসে গেছেন যাঁর যাঁর খাতা (ভোজপাতা) আর খাগের কলম নিয়ে। আর একজন এসেছেন তিনি বিদেহী। তিনি অন্য জায়গা হতে এসেছেন শুধু পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। তারপর চলে যাবেন। ১১টা পৃথিবীর মহাপুরুষ সব বসে আছেন। যিনি এসেছেন, তিনি বলছেন, 'আমি যে কয়টা প্রশ্ন বলবো, তার উত্তর দেবে। মীমাংসা করবে। যার উত্তর ভাল হবে, তারটাই নেওয়া হবে। ধূপধূনা জ্বলছে। ফুলের গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। মৌমাছিরা ঘুরছে। হরিণ, খরগোস, বাঘ চতুর্দিকে ভিড় করছে। তারা দেখছে, এঁরাই লেখান। এঁরা আবার খাতা কলম নিয়ে বসেছেন কেন? এমনকি কচ্ছপও এসে উপস্থিত হয়েছে। কবে সমুদ্র হয়েছে। পাহাড় হয়েছে। সেখান থেকে কচ্ছপ এসে হাজির। দেখা গেল, বিরাট একটা পদ্মফুল, পদ্মফুলের এরোপ্লেনে যেন বসলেন। সবাই হাতজোড় করে উঠলো। বসতে বললে সবাই বসে পড়লো।

আর একজন এসেছেন তিনি বিদেহী। তিনি অন্য জায়গা হতে এসেছেন শুধু পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। তারপর চলে যাবেন।

'কি বিষয় জানতে চাও?' একটা ঘরওয়ালী বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলো। তারপর বললো, 'প্রত্যেকে মন্ত্র জপ কর। মন্ত্রের নাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো'। তখন তো Fountain Pen ছিল না। কলমের মধ্যে কালি ভরে ভরে নিত ও চুবাইয়া চুবাইয়া লিখতো। আবার বললো, তোমরা একটু জপ কর, চিন্তা কর। সহস্র বৎসরের সাধনায় যা সহজসাধ্য নয়, তা এক মিনিটে সহজ হয়ে যাবে। নাদ সম্বন্ধে গভীরস্তরে যখন তিনি চক্ষু বুঁজে ধীরস্থির হয়ে বসলেন, আস্তে আস্তে সবাই বসলো এবং যার যার মন্ত্র চিন্তা করতে লাগলো। কেহ আজ্ঞাচক্রে, কেহ

আর বিদেহী যিনি তিনিও তাদের সাথে সুর দিলেন এবং একাকার হয়ে একাগ্রতা সহকারে সহস্রারের ধ্যানে মিশে গেলেন। হঠাৎ এমন শব্দ হতে লাগলো যেন মেঘের গর্জন, ঝড় হতে লাগলো।

সহস্রারে মনঃসংযোগ করলো। আর বিদেহী* যিনি তিনিও তাদের সাথে সুর দিলেন এবং একাকার হয়ে একাগ্রতা সহকারে সহস্রারের ধ্যানে মিশে গেলেন। হঠাৎ এমন শব্দ হতে লাগলো যেন মেঘের গর্জন, ঝড় হতে লাগলো। সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো, যদিও আকাশ পরিষ্কার। ব্যতিব্যস্ত হয়েও কেহ আসন ছেড়ে উঠলো না। ক্রমে ঝড়ের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগলো। অসহ্য ঝড়ের দাপটে আস্তে আস্তে সবাই উঠে পড়তে লাগলো। একজন মাত্র বসে রইলো ধীর স্থির অচঞ্চল। শিল পরতে লাগলো। চারিদিকে ঠক ঠক করে শিল পরছে। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ আবার দেখে, বৃষ্টি নাই। ঝড় বন্ধ হয়ে গেছে। অজস্র পুষ্প বৃষ্টি হয়ে গেছে। একটাও শিল নেই। তাদের ভীমরতি ধরেছিল। কাজেই তারা চলে গেছিল।

এরপর বিদেহী মহান বললেন, প্রশ্ন করতে হলে মাত্র একজনই করতে পার। তোমরা বসো। আর একবার chance দেওয়া হবে। সবাই বসে গেল। যিনি গুরু তন্ময় হয়ে তিনি সুর দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের লিখতে বললেন। আস্তে আস্তে তাঁরা লিখতে লাগলো। কি লিখলো? তিনি আস্তে আস্তে সব বলতে আরম্ভ করলেন। নাদ সম্বন্ধে বলছেন, সেই মূলমন্ত্র হচ্ছে নাদ। নাদ হচ্ছে শব্দ। সকলে খুব লেখায় ব্যস্ত। নাদ বলতে বলতে একটা সুর আওড়াচ্ছেন। তিনি এমনভাবে তন্ময় হয়ে গেছেন, এমনভাবে সেই বিদেহী সাধক নাদধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন, যাতে অন্যান্য মহানদের মন্ত্র তাঁর সঙ্গে একত্রিত হয়। মন্ত্র একত্র হয় কি না দেখার জন্য নাদধ্বনি উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেন। কি বলছেন জান? নাদটাকে বহুভাবে উচ্চারণ করছেন। মন্ত্রটাকে ফোটাচ্ছেন, আলোড়ন করছেন, মাখনে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই মন্ত্রের ঢেউ-এর আলোড়ন হচ্ছে। মন্ত্রটাকে সুরের ঢেউ-এ নিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। এখন কি হচ্ছে? সুন্দর একটা শব্দের ঢেউ মন্ত্রটাকে সুরটাকে একত্রিত করে এক বিরাট শব্দে

নাদটাকে বহুভাবে উচ্চারণ করছেন। মন্ত্রটাকে ফোটাচ্ছেন, আলোড়ন করছেন, মাখনে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই মন্ত্রের ঢেউ-এর আলোড়ন হচ্ছে। মন্ত্রটাকে সুরের ঢেউ-এ নিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন।

* বিদেহী — যোগপ্রভাবে প্রয়োজনে দেহধারণ করে এসেছেন।

রূপান্তরিত করছে, যার অর্থ বিরাট। শব্দ এবং অর্থ বিরাট দুইটাকে একত্রিত করলে একাকার হয়ে যায়; দুধের সঙ্গে চিনি মিশে যেমন একাকার হয়ে যায়। কোন কোন মহানের মন্ত্রের সুর মিশছে না। একজন বলে উঠেছে, ‘আমার তো মিশছে না। কিন্তু কি করি? না মেশাতে অসুবিধা হয়ে গেল’।

সেই বিদেহী সাধক বলছেন, ‘তোমরা আস্তে আস্তে মিশাতে চেষ্টা কর।’ একথা বলার পর তাঁরা আবার মিশাতে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলো। তারপর তাঁদের ভিতর হতে যিনি প্রথম হয়েছেন, তাঁর খাতা দেখা হয়ে গেল। তাঁকে চন্দন পরিয়ে ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি বেদ প্রচারের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে আছেন। ধর্ম প্রচার করছেন। জীবজন্তু থেকে শুরু করে বহু জংলী তাঁর শিষ্য । অনেকেই তাঁর কাছে আসে। আমার তখন অল্প বয়স। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার একটু সময়ের জন্য সাক্ষাৎ।

তিনি - তুমি বালক। তোমাকে বহু বছর সাধনা করতে হবে। তবে তুমি ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে জানতে পারবে।

আমি (বালক ঠাকুর) - শুনে খুশী হলাম। সত্তার সন্ধান পেলে আপনাকে জানাবো।

আবার ঘুরতে ঘুরতে বিকালে উপস্থিত হয়েছি। বললাম, সত্তার সন্ধানও আমি পেয়েছি। তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি পেয়েছ?’

একটা নূতন কেহ কিছু সন্ধান পেলে বা জানলে সবাইকে সেটা জানিয়ে দেবার নিয়ম ছিল। এইভাবে সবাইকে জানিয়ে দেওয়াতে সব এসে হাজির। তারপর তাঁরা আমাকে বলতে বললেন, কি সন্ধান পেয়েছি। সন্ধান আমার খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ তাদের বলতে তো হবে। সব সাধক মহানরা বসেছেন। আমিও সাথে বসে গেছি। সন্ধান তো পেয়েছিলাম। তাদের হাবভাব দেখে তো আবার ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছে। কচ্ছপের ন্যায় গুটিয়ে গেছি। যাইহোক বলতেই

একটা নূতন কেহ কিছু সন্ধান পেলে বা জানলে সবাইকে সেটা জানিয়ে দেবার নিয়ম ছিল। এইভাবে সবাইকে জানিয়ে দেওয়াতে সব এসে হাজির।

হবে। এরমধ্যে ছাইধারী, জটাধারী, নেংটা সব উপস্থিত, দেখলে শিহরিয়া উঠতে হয়।

আমি নীচের দিকে তাকিয়ে শুরু করেছি। যেই শুরু করেছি, একজন বলে, ‘কথা আগে শুনে যাও।’ এইকথা বলে তাঁর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। দেখ, যে ব্যক্তি ভগবানের ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন, তিনি সপ্তলোকে থাকেন। তুমি বল তোমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই ভগবৎ সত্তার বাণীগুলি তুমি বল। ভগবৎ সত্তার সহিত তোমার বোধশক্তির যে একাত্মতা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তুমি বল।

আমি (বালক ঠাকুর) - আমি শাস্ত্রটাস্ত্র জানি না। তবে যে জিনিসটা আমি জেনেছি, সেটা আমি ব্যক্ত করবো। এরমধ্যে আর একজন লাফ দিয়ে বলে, শোন, আমরা বহুবছর সাধনায় নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি। আজও সন্ধান পাইনি। তাঁরা সবাই তখন তাঁদের নিজেদের সাধনার কথা বলতে শুরু করেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করাতে কেহ বলে ‘পাই নাই।’ কেহ বলে, ‘পেয়েছিলাম। তবে চলে গেছে। পরে বলবো।’ তারপর হেডকে অর্থৎ প্রধান প্রভু যিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটু, হাসলেন। হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার একটু হয়েছে।’

আমি (বালক ঠাকুর) - একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। ‘‘ভগবানের ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে জানতে চাইলে ‘পরে বলবো’, এরূপ কথা বলে নাকি? আমি ‘পেয়েছি’ বলে ফ্যাসাদে পড়লাম নাকি?’’

‘‘ভগবানের ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে জানতে চাইলে ‘পরে বলবো’, এরূপ কথা বলে নাকি? আমি ‘পেয়েছি’ বলে ফ্যাসাদে পড়লাম নাকি?’’

তিনি (প্রধান সাধু) - না, তুমি যা পেয়েছ বলো। আমাকে বলতে বলে, তিনি নিজেই নাদ সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করেছেন। উনি আমাকে আক্রমণ করছেন। আমি যাতে ভয় পাই, এমনভাবে তিনি বলছেন। বারবার বলছেন, প্রত্যেকটার যদি উত্তর না দিতে পারো, তাহলে কি হবে? এইভাবে

যেন মন্ত্রের তীর ছাড়তে লাগলেন আমার উপর। আবার বলছেন, দেখ, তুমি এমন কথা বলতে পারবে না, যাতে ভগবান ছোট হয়ে যায়।

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম, তুমি কি বলছো? তারপর আমি ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে বললাম। তুমি বারবার করে বলছো, ভগবানের ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে জানানোর কথা। সেটা জানার আবার চেষ্টা কি করবো নতুন করে? আমরা নিজেরা তো বুঝেই সৃষ্টি হয়েছি। স্বরূপ বুঝে আমরা ভরপুর।

তিনি - কেমনে?

আমি - ভগবৎ সত্তা সর্ববস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে ব্যক্ত করছি, প্রকাশ করছি, সে তাঁরই প্রকাশ। এই প্রকাশ এক সত্তারই সত্তা। এই বিশ্বসৃষ্টি একটা সত্তা হতেই। এক সত্তা হতেই সৃষ্ট হয়ে ব্যক্ত হয়ে গেল। অজ্ঞান আমরা নই। এই বিশ্বলোকের একটা শক্তিকে যে স্রষ্টা জাগায়েছে, সেই শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। তোমাদের প্রশ্ন ভুল। তুমি যদি আমার পিতাকে চিনে থাকো, আবার যদি জিজ্ঞাসা করো, ‘উনি কি তোমার পিতা?’ তবে বুঝতে হবে, চিনে নেওয়ার মাঝেই আছে সঠিকতার অভাব। তুমি ভগবানের ভগবৎ সত্তা জেনে থাকলে আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন? যেদিন হতে সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন হতেই প্রতি বস্তুতে, প্রতি জীবে তাঁর সন্ধান পেয়েছো। দোসরা কথা এর মধ্যে আসতে পারে না। অর্থের মারপ্যাঁচ খুব সহজ মারপ্যাঁচ। মন্ত্রের মধ্যে এমন কিছু নেই যে, মন্ত্র উচ্চারণ করলেই আপনিই সব হয়ে যায়।

ভগবৎ সত্তা সর্ববস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে ব্যক্ত করছি, প্রকাশ করছি, সে তাঁরই প্রকাশ। এই প্রকাশ এক সত্তারই সত্তা। এই বিশ্বসৃষ্টি একটা সত্তা হতেই। এক সত্তা হতেই সৃষ্টি হয়ে ব্যক্ত হয়ে গেল। অজ্ঞান আমরা নই।

তিনি - মন্ত্র উচ্চারণ করলেই সব কিছু হয় না?

আমি - সবই মন্ত্র। গালিগালাজ থেকে সুরু করে প্রতিটি শব্দই মন্ত্র। তবে আলাদা করে মন্ত্রের স্থান দিচ্ছ কেন?

তিনি - বিশেষভাবে স্থান দেওয়ার দরকার হয় না?

আমি - না, তার দরকার হয় না।

তিনি - সমস্ত জীবলোকই কি তবে ভগবৎ সত্তার সাথে মিশে যাবে?

আমি - সবাই মিশেই আছে। চক্ষু বুঁজে আছ বলেই কিছু দেখতে পাচ্ছ না।

তিনি - ঘুমিয়ে আছি আমি?

আমি - হ্যাঁ, ঘুমিয়ে আছ। জীবলোকে সবাই ভগবান। স্রষ্টা যে গুণ নিজে সৃষ্টি করেছেন, সেই গুণ আছে সবারই মধ্যে।

জীবলোকে সবাই ভগবান। স্রষ্টা যে গুণ নিজে সৃষ্টি করেছেন, সেই গুণ আছে সবারই মধ্যে।

তিনি - ইহা অর্থাৎ এই মত কি সবাই গ্রহণ করবে?

আমি - না গ্রহণ করবে তো কি হবে? যাহা সত্য তাহাই বলো। তোমরা কিরকম হয়ে গেছো যে, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, চাকর বাকরের মধ্যে ভগবানকে ফেলতে পারছো না? যেখানে প্রাণশক্তি আছে, চেতনা আছে, চৈতন্য আছে, তাহাই ভগবৎ সত্তা। বিশ্বের সর্ববস্তুতেই ভগবৎশক্তির স্ফূরণ। ইহাই প্রত্যক্ষ সত্য।

আমার কথায় তারা সবাই এক দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। এরকম তো আর শোনে নাই। আমাকে বলছে, 'তাদের (সর্বজীবের) অন্তর্যামিত্ব নেই। তারা ছলচাতুরী করছে, গোলমাল করছে।'

আমি - Mixture এর ভিতর একটু এ্যাসিড বা বিষও থাকে। ঔষধ হিসাবে তার প্রয়োগ। এতবড় শক্তিতে কি Mixture থাকবে না? এই দুনিয়াটা এক Mixture. এক বোতল Mixture-এ একটা পদ খুঁজে খেতে গেলে মুস্কিল। সবটা মিশিয়ে একটা মাত্রায় খাও, তাহলেই হবে। তুমি যে 'ছল চাতুরী', 'মিথ্যা-র'

এই দুনিয়াটা এক Mixture. এক বোতল Mixture-এ একটা পদ খুঁজে খেতে গেলে মুস্কিল। সবটা মিশিয়ে একটা মাত্রায় খাও, তাহলেই হবে।

কথা বলছো, এগুলো না থাকলে তো Mixture-ই থাকবে না। আমাদের ভিতরে সবই আছে। ছল বলো, চাতুরী বলো, সব এই Mixture-এর বোতলেই ভরা।

তিনি - তুমি ঠ্যাটা।

আমি - জিনিসটাই যে ঠ্যাটা। এর মধ্যে অন্য এক সাধক বলছেন, হ্যাঁ বাচ্চা, তুমি ঠিক বলেছ, তুমি বলে যাও।

তিনি - তবে অন্তর্যামিত্ব নেই কেন?

আমি - কেন, কি দরকার? ক্ষুধা লেগেছে, তাই খাও। ক্ষুধা লেগেছে কি না যন্ত্র দিয়ে জানার দরকার কি? ২টা পয়সা দিয়ে যে চিঠি ফেলা (post) যায়, তারজন্য মেহনত করার দরকার কি?

তিনি - শূন্যে হাঁটা, উড়া?

আমি - তুমি নদীর উপর দিয়ে হাঁটলে আর শূন্যে উড়লে। আর আমি ২ পয়সা দিয়ে গোদাবরী নদী পার হলাম। যেখানে শেষপর্যন্ত সবাই পঞ্চভূতে মিশবে, এটা যখন বুঝে ফেলেছি, এই পঞ্চভূতে মেশার জন্য আবার আলাদা পরিশ্রম করার দরকার কি? এই যে ছোট শিশুর ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি এই পর্যায়ে এসেছে কি করে? মিশে মিশেই তো। জানোয়ার থেকে ভদ্র হলো, চার পা থেকে দুই পা হলো। তবে ঐসব গেল কোথায়? আমরা রোজই সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিশে যাচ্ছি। আমি (station to station) গাড়িতে চলছি। বম্বে যাব, হঠাৎ মাঝপথে নামবো কেন? এখন station পার হচ্ছি। ব্যথা, রোগ, শোক, দুঃখ এইগুলি জীবনের station, শেষ নিঃশ্বাস ফেলবো যেখানে, সেখানেই শেষ। তার আগে নামবার দরকার কি? একবার আমার এক শিষ্য চা খেতে গিয়ে train ফেল করলো। চা এত গরম ছিল যে, খেতে পারেনি। গাড়ী ছেড়ে দিল। আমি চলে এলাম। কোন অবস্থায় যাতে ট্রেন ফেল না করো, তাহাই দেখবে।

আমি (station to station) গাড়িতে চলছি। বম্বে যাব, হঠাৎ মাঝপথে নামবো কেন? এখন station পার হচ্ছি। ব্যথা, রোগ, শোক, দুঃখ এইগুলি জীবনের station শেষ নিঃশ্বাস ফেলবো যেখানে, সেখানেই শেষ।

আমরা জলে স্থলে আকাশে বাতাসে অনিমা লঘিমাতে আছি। আমরা পঞ্চভূতের ছাতা নিয়ে চলি যখন, এই ছাতা মেলে দেব, সব মিশে যাবে। স্বয়ং স্রষ্টার যদি হয়ে থাকে, তবে আমাদেরও হয়ে গেছে। তাঁর কিছু না হলে আমাদেরও হয় নাই।

তিনি - এ্যাঁ, তুমি কি বলছো? স্রষ্টা তো ভরপুর। তিনি তো পূর্ণ।

আমি - আমরাও ভরপুর, আমরাও পূর্ণ। যদি স্রষ্টা সেরূপ হন, আমরাও তাই। দূরদর্শন, দূরশ্রবণের সঙ্গে ভগবান পাওয়া না পাওয়ার সম্পর্ক কি? দূরশ্রবণ প্রত্যেকেরই আছে। আমরাও তারজন্য সেইশক্তি ব্যবহার করি নাই। তুমি ব্যবহার করেছ? নিয়মই হচ্ছে, একজনের ভিতর যা থাকে, প্রত্যেকেরই ভিতর সেই শক্তি বা জিনিস থাকে।

তিনি - স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন চতুর্বাহু, এভাবে দেখ নাই? সেইটাই তো প্রকৃত দর্শন।

আমি - চার বাহু দেখেই আপনি ঘাবড়িয়ে গেলেন? আর অগণিত পা, অগণিত হাত, অগণিত চক্ষু, অগণিত রূপ দেখেও কি আপনার কিছুই হলো না? এই চতুর্বাহু দেখা আপনার ভীমরতি মাত্র, কারণ চক্ষু বুঁজলেই যা দেখা যায়, সেইটাই প্রকৃত রূপ নয়। এই বাস্তব হতে যে প্রকৃত সত্য প্রকৃত রূপ বাহির করতে পেরেছে, সেইটাই খাঁটি। মনে মনে আপনি যা আনছেন, তা বাস্তব আকৃতিরই একটা রূপ। একটা রূপে আছেন বলেই আর একটা রূপকে চিন্তা করতে পেরেছেন, আরেকটা রূপ আনতে পেরেছেন। এই কখগঘ ইত্যাদি এই বাস্তবে আছে বলেই ওই রূপ দেখতে পারছেন। তুমি চতুর্বাহু কল্পনা কর। তাতে কচ্ছপ হাসে, মাকড়সা হাসে। আমাকে দেখে তো কচ্ছপ ক্ষমা করে না। আমরা মাছ, কচ্ছপ খাই। কচ্ছপ মাছ আমাদের খায়। সুতরাং তুমি যে রূপ চিন্তা করলে এখান হতেই নিলে। তারপর তুমি যে মন্ত্র নিলে, তাহাও এখান হতেই বেছেটেছে নিয়েছ।

> এই বাস্তব হতে যে প্রকৃত সত্য প্রকৃত রূপ বাহির করতে পেরেছে, সেইটাই খাঁটি। মনে মনে আপনি যা আনছেন, তা বাস্তব আকৃতিরই একটা রূপ। একটা রূপে আছেন বলেই আর একটা রূপকে চিন্তা করতে পেরেছেন, আরেকটা রূপ আনতে পেরেছেন।

তিনি - হ্যাঁ, কৃষ্ণায় নমঃ।

আমি - তাহলে দেখলে যে শব্দ আছে, ভাষা আছে, ভাব আছে, সেখান হতেই তো নিলে। তারপর অনিমা, লঘিমা, অন্তর্যামিত্ব কোত্থেকে জানলে? এখান হতেই। সুতরাং দেহ তোমার এখানে এসেছে, সেই দেহ দিয়েই, সেই চক্ষু দিয়েই দেখলে। তাহলে তাঁর (ভগবানের) গুণ বুঝার বা প্রকাশ করার ক্ষমতা এই দেহতেই রয়েছে। একটি ছোট ফুল দেখলে। এই ফুল হতে তোমার দৃষ্টি, তোমার ভিতরে দর্শন ক্রিয়া এত দ্রুততম গতিতে নিষ্পন্ন হলো যে, তুমি দেখলে একটি ছোট ফুল। আবার এরূপ জীব আছে, যার এই ফুলটা ঘুরে আসতে চার বৎসর লাগে। সগুণ হওয়ার গুণ আছে, বুঝ আছে বলেই জানার ক্ষমতা আছে। জানার ক্ষমতা আছে বলেই স্রষ্টার সম্বন্ধে জানতে পেরেছ। বীজ পকেটে নিয়ে ঘুরলেও ফুলের ধারণা না থাকলে এই গোলাপ ফুলের রূপ বুঝতে পারতে না। এই গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সেই বীজ সেই মন্ত্র এমনভাবে রোপণ করা আছে যে, গাছ হতে ফুল ফল ফুটে উঠবে। সেই সাধনা করে যাচ্ছি বলেই এই যে যা দেখছো কোনটা গাছের ফুল, কোনটা গাছের ফল। আবার কোনটা বা মাটি। একই মাটির কত গুণ। এই মাটি হতেই রস টেনে নিম তার তিক্ততায়, খেজুরের রস তার মিষ্টত্বে, তেঁতুল তাঁর অম্লত্বে, টকে প্রকাশ করছে। এক মাটি হতেই যে যার সাধ্যমত স্বাদ আহরণ করছে। আমরা এই বিশ্বটাতে আদি এবং বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখছি। মনুষ্য রূপই শুধু রূপ নয়; অগণিত রূপের প্রকাশ করেছে এই পৃথিবীতে। ভাব একই; এক ভাবই রয়েছে সর্বত্র। আমাদের চিন্তায় মুক্ত ভাব, মুক্ত সুর যাতে থাকে, তাই দেখা দরকার। শুধু গাঁথুনি বাঁধলাম। আজ এই থাক।

> বীজ পকেটে নিয়ে ঘুরলেও ফুলের ধারণা না থাকলে এই গোলাপ ফুলের রূপ বুঝতে পারতে না। এই গ্রন্থিতে সেই বীজ সেই মন্ত্র এমনভাবে রোপণ করা আছে যে, গাছ হতে ফুল ফল ফুটে উঠবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

গভীর মনঃসংযোগ তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়ক

ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ
৯ই মার্চ, ১৯৫৭, সময় ঃ বিকাল ৫-৪৫মিঃ

ভক্তির ভিতর দিয়ে তত্ত্ব একটু সহজ করে বলছি। জ্ঞান আর ভক্তি একই জায়গায় নিয়ে যায়। তবে বেশীরভাগ মানুষ জ্ঞানের ভিতর দিয়ে যেতে চায় না। কারণ জ্ঞানটা রসকষহীন কাঠখোট্টা জিনিস। আর ভক্তি সবসময় ‘হায় ঠাকুর’, ‘হায় ঠাকুর’ করতে থাকে। চূড়ান্ত ভক্তি নির্ভরতায় যদি অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয়, তাহা হইলে একই গভীর গতি হবে। আমাদের কি একটা কথা আছে, ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।’ একটা জিনিস জেনে রাখবে, তুমি যখন ঠাকুরকে ডাকছো, কি করে ডাকলে তিনি সাড়া দেন, তার রহস্য কি? জানা দরকার।

জ্ঞান আর ভক্তি একই জায়গায় নিয়ে যায়। তবে বেশীরভাগ মানুষ জ্ঞানের ভিতর দিয়ে যেতে চায় না। কারণ জ্ঞানটা রসকষহীন কাঠখোট্টা জিনিস। আর ভক্তি সবসময় ‘হায় ঠাকুর’, ‘হায় ঠাকুর’ করতে থাকে।

শাস্ত্রে আছে জপ তপ ক্রিয়া পদ্ধতিতে সিদ্ধিলাভ হয়। কেউ কেউ পেয়েছেন শোনা যায়। কিন্তু বেশীরভাগই শোনা যায়, মন বিক্ষিপ্ত, মন চঞ্চল। প্রকৃত প্রস্তাবে কি করলে কি হয়, জানতে হবে। জ্ঞানের দিক দিয়ে গেলে কি হয়? ঠাকুরকে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেন। কাউকে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়। কিভাবে কি হয়, তত্ত্বটা জানতে হবে। অন্ধকে যেকোন ঘরে রাখা যায়। যেখানেই রাখা হোক না কেন, তার একই অবস্থা। বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাকে দেখা করানো হলো। বলা হলো, হাতী দেখানো হলো। সে (অন্ধ ব্যক্তি) বললো, ‘হুঁ’।

তাকে বলা হলো, গরু দেখানো হলো। সে বললো, ‘হুঁ’। অন্যের

কথা শোনার উপরে তার (অন্ধ ব্যক্তির) ধারণা। সে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য বস্তু সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারছে না। চোখে দেখলে যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সত্য বস্তুকে জানা যায়, তত্ত্বজ্ঞান সেইরকম।

খাওয়ার আগে শাস্ত্রে পঞ্চভূতকে নিবেদন করার কথা আছে। প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা। সুস্থ চিন্তা, সুস্থ মন নিয়ে যদি খাওয়া যায়, সেটাই দেহের ভিতর কাজে লাগে। যেমন খাদ্যে চুল পড়েছে বললেই বিপরীত ফল হয়। যোগ, ধ্যান, গভীর মনঃসংযোগের ফলে লাভ হয় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্ব যদি বুঝা যায়, তার যে ধ্যান, তার যে যোগ, সেই যোগাযোগের যোগসূত্রে মনে বহুল ভাবে ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কি করে? ‘ঠাকুর’, ‘ঠাকুর’, ‘ঠাকুর’ বলে কাঁদছে। কিন্তু কি হচ্ছে, বলতে পারছে না। নানারকম বিরহভাব তৈরী করে একটু চোখের জল ফেললো। ভক্তিতে ভাবে ঠাকুরের জন্য কষ্ট পাচ্ছে। ঠাকুর নানারকম দুঃখকষ্ট পেয়ে গেছেন। নিজের ছেলে পিলে অশান্তি ভেবে আরও দুফোঁটা চোখের জল ফেললো। কিন্তু ঠাকুর শুনলেন কি না জানতে পারলো না। সেটা জানা দরকার। ভক্তির ভিতটা দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। তিনি শুনছেন কি না, যখন তুমি জানবে, ডাকার আগ্রহ বাড়বে। যদি জানো তিনি নদীর ওপারে আছেন, ডাকলে শুনবেন, তাহলে একবারের জায়গায় পাঁচবার ডাকবে। কিন্তু যদি না শোনেন, তাহলে ডাকতে ভাল লাগবে না।বাচ্চা শিশুকে রামায়ণ মহাভারত বলতে ভাল লাগে না। কারণ সে শুনে কিছুই বুঝতে পারবে না। কিভাবে ডাকলে তিনি আমার ডাক শুনবেন, সেটা বুঝে নিলে আর অসুবিধা থাকবে না। তুমি শুনলে তিনি (ঠাকুর) অন্তর্যামী, সকলের ডাক শোনেন। কিন্তু তুমি তো জানলে না, তিনি শুনেছেন কি না। তাই জানার পথে জানতে জানতে এগিয়ে যেতে হবে। সঠিকতার সুরে তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত জ্ঞান লাভেই হবে সকল রহস্যের সমাধান।

যোগ, ধ্যান, গভীর মনঃসংযোগের ফলে লাভ হয় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্ব যদি বুঝা যায়, তার যে ধ্যান, তার যে যোগ, সেই যোগাযোগের যোগসূত্রে মনে বহুল ভাবে ফল পাওয়া যায়।

তুমি শুনলে তিনি (ঠাকুর) অন্তর্যামী, সকলের ডাক শোনেন। কিন্তু তুমি তো জানলে না, তিনি শুনেছেন কি না।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

কঠিন বাস্তবের উপর অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত

৪৬ নং ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

আদিবেদের ধ্বনি, আদিবেদের শব্দ, এটার অনেক ক্ষমতা, এটার অনেক কাজ। বেদের অর্থ কিভাবে বিকৃত হয়ে যায়। বেদ আদি শাস্ত্র বাস্তবের ভিতরই ছিল। বাস্তবে জীবজগতের জীবনগ্রন্থের ভিতর দিয়ে এই শাস্ত্র আস্তে আস্তে তৈরী হতে থাকে। প্রত্যেকটি যন্ত্রের যেমন সা-রে-গা-মা আছে, তেমনি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত প্রত্যেকটি সুরের (চক্রের) ভিতর দিয়ে এল শাস্ত্র, মন্ত্র। তারপর এই বাস্তবে আস্তে আস্তে করে সুরে আনতে চেষ্টা করলো। যেটা ছিল ব্যাপক, সেটা কেন আনলো সীমাবদ্ধে? ব্যাপক ভাবতে অসুবিধে বলেই সীমাবদ্ধের সুরে আনতে চেষ্টা করলো। এখানে যেমন সা-রে-গা-মা সাধে না? ঠিক বাচ্চা শিশুর এলোমেলো কথার মত, অর্থ বুঝা যায় না। কিন্তু সেই এলোমেলো কথা বা এলোমেলো সুর যা বের হয়, সেটাই অ আ ক খ - তে সীমাবদ্ধে আনে। এলোমেলো হলেও তার (বাচ্চা শিশুর) অন্তরে রয়েছে গভীর নিনাদ। যে শিশু যে দেশে থাকে, সেই দেশেরই ভাষা শেখে। সেটাই সুরে আনে। সুরে যে ছিল, সেটা কোন্ সুরে ছিল? সেই অনাহতে যে সুর বাঁধা আছে, তাতে আছে ব্যাপক সুর। সেই শিশু সেই অনাহতের ধ্বনিকে, সেই হুঙ্কারকে সীমাবদ্ধে আনলো। সেই দেশের সুরে বা গ্রন্থের ভাষায় আনলো।

ঠিক বাচ্চা শিশুর এলোমেলো কথার মত, অর্থ বুঝা যায় না। কিন্তু সেই এলোমেলো কথা বা এলোমেলো সুর যা বের হয়, সেটাই অ আ ক খ - তে সীমাবদ্ধে আনে। এলোমেলো হলেও তার (বাচ্চা শিশুর) অন্তরে রয়েছে গভীর নিনাদ।

সুর সাধতে সাধতে এখানকার সুর সাধা হয়ে যায়। সেই সুরই বলে দেয়, কিভাবে সেই অনন্ত সুরকে জানা যায়। এই যে রূপান্তরিত ভাব, রূপান্তরিত সুরের লহরী, সেই সুরে সুরেই অনন্ত সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সেই সুরকে কিভাবে ভাবে আনা যায়, তারজন্যই সাধনা। ভগবান কোথায় আছেন? সেটা পাওয়া যায় কথাবার্তায়, পুঁথির লেখায়। বাস্তবে শ্রবণে সীমাবদ্ধে আছে যেই সুর, সেই সুরকে আয়ত্ত করে কিভাবে অনন্ত সুরে পৌঁছানো যায়? ভগবান কি? ভগবান কোথায়? বারেবারেই এই জিজ্ঞাসা আসে মনের মনিকোঠায়।

ভগবান আছেন লেখনীর ছন্দে, কথায় বার্তায়, শ্রবণে। এতবড়, এতবিরাট ভগবান শুধু লেখনীতে থাকবেন, সেটাতো হতে পারে না। এটা তত্ত্বের কথা। বেদের যে আদি, যে আদি মন্ত্র, আদি পালি ভাষা তাতে আছে, এখানে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা শুধু একটা চামড়ার উপরে। এই চামড়ার আবরণ বাদ দিলেই এসে যায় বৈরাগ্য। তখন যত রূপবান আর রূপবতী থাক, কেহ তাকায় না, সকলেই এড়িয়ে যায়। দুদিন যখন হয়ে যায়, পচা দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দেয়। সুতরাং কোথায় প্রেম? কোথায় ভালবাসা? যে রূপবান বা রূপবতীর জন্য প্রাণ দিয়েছে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, ভাব বৈরাগ্যের কত ঢেউ অহর্নিশ খেলে গেছে, বিরহ মিলনের কত কথা বলেছে, কত মান অভিমান করেছে, সেই ব্যক্তি আজ কোথায়? আজ তাকে কোথায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছে?

ভগবান আছেন লেখনীর ছন্দে, কথায় বার্তায়, শ্রবণে। এতবড়, এতবিরাট ভগবান শুধু লেখনীতে থাকবেন, সেটাতো হতে পারে না। এটা তত্ত্বের কথা।

সেই কথাই হচ্ছে এই কথা। এটাই তত্ত্ব। এই চামড়ার ভিতরে কি আছে, সেটাই তোমাদের শিখতে হবে; চামড়ার উপরের কথা শুধু নয়। এটা তুলির প্যাঁচ নয়। ধারাল অস্ত্র (জ্ঞানরূপ অস্ত্র) দিয়ে ছেদন করতে হবে। সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে। তত্ত্বের গভীরে ডুবুরী হয়ে ডুব দিতে হবে। এটাই বেদগ্রন্থ। চামড়া উঠলো। গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করেছ। দেহের ভিতরে আছে রক্ত, মাংস, বীর্য, বিষ্ঠা, ক্রিমি ইত্যাদি। এদের সমন্বয়েই দেহ।

তার ভিতরকার কথাই তত্ত্ব। তত্ত্ব কোথাকার কথা? দেহের ভিতরকার কথা। এটাই আধ্যাত্মিক কথা। এটাই অধ্যাত্মবাদ। আধ্যাত্মিকতা, অধ্যাত্মবাদ* দেহ ছাড়া নয়, বাস্তব ছাড়া নয়। কঠিন বাস্তবের উপর অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত।

তত্ত্ব কোথাকার কথা? দেহের ভিতরকার কথা। এটাই আধ্যাত্মিক কথা। এটাই অধ্যাত্মবাদ। আধ্যাত্মিকতা, অধ্যাত্মবাদ দেহ ছাড়া নয়, বাস্তব ছাড়া নয়। কঠিন বাস্তবের উপর অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিতে যখন দেশ ছেয়ে ফেললো, সব লোক তার কাছে গিয়ে পড়লো। শুধু বিভূতি দেখে কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবে না। কেন? ভগবানের একটা পরিচয় বিভূতিতে আছে। প্রত্যেকটা গাভী বা গরুতে দুধ নেই। গাভী দেখলেই বুঝা যায় না, দুধ আছে কিনা। দোহন করে দুধ পেলে তবেই বুঝা যায় দুগ্ধবতী গাভী। তাই দেখ, দুধ আছে কি না। দেখ, ওঁর (শ্রীকৃষ্ণের) তত্ত্ব আছে কি না। বিশ্বের তত্ত্ব গাভীর মত ওঁর (শ্রীকৃষ্ণের) থেকে নিংড়াও; দুধ দোহন কর। তত্ত্ব যদি তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) ভিতর থেকে পাওয়া যায়, তবেই তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভগবান বলে স্বীকার করা হবে।

ঋষিদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন কাঁচুমাচু হয়ে। তত্ত্বকথায় যদি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবেই তিনি ভগবান কি না, তার পরিচয় হবে। ঋষিরা একে একে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "হে কৃষ্ণ, তোমার সঙ্গে যে বাকবিতণ্ডা হচ্ছে, তা শুধু চামড়ার উপরের কথা নিয়ে নয়। আমরা জানতে চাই ভিতরের কথা। তুমি যদি বাস্তবিকই ভগবান হয়ে থাক, তুমি সেই ভগবৎ প্রেমের বন্যায় আমাদের ভাসিয়ে দাও। আমাদের উপরে তত্ত্বের বৃষ্টি বর্ষণ করো। সেই বৃষ্টিতে আমাদের ভিজিয়ে দাও। গভীর সুরে স্নান করিয়ে দাও। আমরা অবগাহন করতে চাই সেই নিনাদের সুরে, যেই সুরে ডুবলে আর উঠা যায় না। সেই মহানিনাদে আমাদের ডুবিয়ে দাও। সেই বুঝে বুঝিয়ে দাও। সেই গভীর বুঝ (জ্ঞান), সেই বুঝের কথা আমাদের বুঝিয়ে দাও। আমরা তখন বুঝবো, তুমি কোন্ বুঝের মাঝে আছ।"

---

* দেহম্ অধিকৃত্য ইতি অধ্যাত্মম্।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বেদের থেকে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) বলতে আরম্ভ করলেন বেদের আদি কথা। ডুবে গেলেন কৃষ্ণ সেই গভীর তত্ত্বে। সেই তত্ত্বের সুরে সুর দিলেন। সেটা বাঁশের বাঁশী যে বলে, তা নয়। সেই বাঁশের বাঁশীর বাঁশ কোথায়? তিনি অনাহতে, বিশুদ্ধে সুর দিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করলেন। আজ্ঞাচক্রে নিজেকে উদ্ভাসিত করলেন। নিজে নিজে সেই সহস্রারে উপবেশন করে বিশুদ্ধে নাদের টান দিয়ে, অনাহতে হুঙ্কারের টান দিয়ে, নিজের ভিতরকার সমস্ত শিরা উপশিরায় সুরের টান দিয়ে নিজের সুর মহাশূন্যের মহানিনাদের সাথে মিলিয়ে দিলেন। তিনি বাঁশের বাঁশীতে বাইরের সুর বাজান নি। বাচ্চা শিশুর ভিতরে যেমন শিরা দিয়ে খাদ্য, রক্ত সঞ্চালন হয়, তেমনিভাবেই তিনি নিজের ভিতরের সুরে সুর দিয়ে অনন্ত মহাসুরে মিলিয়ে গেলেন। সুরের জগতে, অনন্ত জগতের সঙ্গে এক নিগূঢ় যোগাযোগের যোগসূত্রে নিজেকে একাত্ম করে দিলেন। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন তত্ত্ব। অনর্গল সেই তত্ত্ব ফোয়ারার মত, ঝরণার জলের মত বয়ে চলেছে। ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি মহা নিনাদের সুরে মহাসাগরের মত গভীর তত্ত্বের কথা বল। সেই তত্ত্বের মহাসাগরে আমাদের ডুবিয়ে দাও।" এখন তাঁরা (ঋষিরা) অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলেন, শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বে মহানিনাদের গভীরে মহাসাগরের সৃষ্টি হচ্ছে।

তুমি যদি বাস্তবিকই ভগবান হয়ে থাক, তুমি সেই ভগবৎ প্রেমের বন্যায় আমাদের ভাসিয়ে দাও। আমাদের উপরে তত্ত্বের বৃষ্টি বর্ষণ করো। সেই বৃষ্টিতে আমাদের ভিজিয়ে দাও। গভীর সুরে স্নান করিয়ে দাও। আমরা অবগাহন করতে চাই সেই নিনাদের সুরে, যেই সুরে ডুবলে আর উঠা যায় না।

ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি মহা নিনাদের সুরে মহাসাহরের মত গভীর তত্ত্বের কথা বল। সেই তত্ত্বের মহাসাগরে আমাদের ডুবিয়ে দাও।"

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে ঋষিগণ, "পর্বত কন্দর হতে, এতটুকু নালা হতে ঝরণার সৃষ্টি হয়। তারপর সেই ঝবণা নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে। সেইরকম আমি ঝরণার (তত্ত্বের) গতির কথা, একেবারে মূল হতে তত্ত্বের অনন্ত গতির কথা জানাচ্ছি। তোমরা স্মরণ কর।"

সেখানে যাঁরা (যেসব ঋষি, মহান) উপস্থিত ছিলেন, সবাই এক একজন বিরাট। কেউ আজ্ঞাচক্রের অধিকারী, কেউ সহস্রারের অধিকারী। এখন সেই কুলকুন্ডলিনীর সর্প যেমন সুরে সুরে জাগ্রত হয়ে বিরাট আকারে ফণা ধরে সটান হয়ে থাকে, তেমনি বেদের সুরে, বেদের তত্ত্বে, শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অনর্গল তত্ত্বের ফোয়ারায় ঋষিরাও সটান হয়ে বসলেন। তাঁরা একসুরে সবাই বলে উঠলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি কি?"

ঋষিরা সবাই হাতজোড় করে বললেন, "হে সুরজ্ঞ, হে কৃষ্ণ, তোমার সুরে আমাদের সুর এক করে নাও। আমাদের জানিয়ে দিলে তুমিই ভগবান। ভগবানের রূপ নানা বর্ণনায় শুনেছি। আর আজ বাস্তবে ভগবানের পরিচয় হয়ে গেল। সেই সুর চামড়ার উপরের নয়। সেই সুর ভিতরের, দেহের ভিতরের। সেই তত্ত্ব, বাস্তবের যে তত্ত্ব, বাস্তবের যে জ্ঞান, বাস্তবের যে সুর, তা আয়ত্ত করা যায়। অনন্ত জগতের যে সুর, আগে তাকে কি করে আয়ত্ত করা যাবে? অনন্ত সুরকে আয়ত্ত করতে হলে মূল সুরকে আয়ত্ত করতে হবে।"

ঋষিরা সবাই হাতজোড় করে বললেন, "হে সুরজ্ঞ, হে কৃষ্ণ, তোমার সুরে আমাদের সুর এক করে নাও। আমাদের জানিয়ে দিলে তুমিই ভগবান। ভগবানের রূপ নানা বর্ণনায় শুনেছি। আর আজ বাস্তবে ভগবানের পরিচয় হয়ে গেল।

আগুন যেমন শিশু, বৃদ্ধ কাউকে ক্ষমা করে না, জ্ঞানাগ্নিতেও সব অজ্ঞান, সব অন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। সেই আগ্নেয়গিরির অগ্নি, সেই অগ্নিকুন্ড মূলাধারে প্রজ্জ্বলিত। সেই অগ্নিকুন্ড হতে সূর্য সৃষ্টি হয়েছে, যে সূর্য দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই অগ্নি আমাদের মূলাধারে আজও আছে। সেই মূল সুর, সেই মূল মন্ত্র তাকেই জাগাতে হবে। সেই সুর যেটা রয়েছে, তারজন্য প্রচেষ্টার বাইরে কোন কিছু করতে হবে না। আপনি হয়ে যাবে। যেমন করে জন্ম মৃত্যু হয়, আর একটি সৃষ্টির মাঝ দিয়ে হয়ে যায়। এটাও ঠিক তাই। এলোমেলোর ভিতর দিয়ে আপনি প্রকৃতির নিয়মের মত সেইভাবে সেই আসার গতি অনুযায়ী হয়ে আসছে। সেই গতি অনুযায়ী অনুগুলি অনুধাবিত হচ্ছে সেই অনুর সন্ধানে। সেই একগতিতে একগতি হওয়ার জন্যই

একগতির নিয়ম। সুতরাং তোমরা গতির সাধনাই করবে। ভগবান আছে কি নেই, না জেনে ভগবানকে আগেও ডাকবে না, পরেও ডাকবে না।

যারা সাগরের উপরে জাহাজে থাকে, তারা কোথায় যায়, নিজেরাও জানে না। compass - এর (কম্পাসের) যন্ত্র ঠিক করে নেয় কত ডিগ্রী। ঐ কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছে। compass - এর কাঁটা যেখানে পৌঁছাবে, তারাও সেখানে যাবে। নামটা শুধু জানা থাকে গন্তব্যস্থলের। compass - এর কাঁটা দেখে দেখে আমরাও সেইভাবেই থাকবো। আমাদের তত্ত্বের গতি compass - এর কাঁটা। আমরা গতির সাধনা করবো। আমরা পৌঁছাব কোথায়? ভগবানের কাছে, না অন্যত্র যাচ্ছি, আমাদের জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। কাঁটাটি যেই মুখী হয়ে আছে, সেই মুখী হয়ে আমরা সেই দেশে পৌঁছাব। সেটা যদি ভগবানে শেষ হয়ে থাকে, তবে সেখানেই পৌঁছাব; নয় অন্যদেশেই যাব। যে নিয়মে, যে গতিতে এই জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই গতির নিয়মাবলীর দ্বারা গতির কাঁটা অনুযায়ী যাওয়াই সাধনার উদ্দেশ্য। আমরা সেই চেষ্টাই করবো। আমরা সেই সাধনা, সেই মূলমন্ত্র জপ করে যাচ্ছি। আমাদের সাধনা হচ্ছে কাঁটাটি যেন ঠিক থাকে। জন্ম মৃত্যু যেমন চলেছে; তার স্তর পার হয়ে হয়ে যেভাবে পরিণত হয়, আমরাও তেমনই জন্মমৃত্যু পার হয়ে হয়ে এগিয়ে চলেছি। এই প্রকৃতি পুরুষের মিলনের গতি দিয়ে, আমরা এক গতির দিকে, এক অনন্ত গতির দিকে এগিয়ে চলেছি। এ চলার বিরাম নেই। জীবজগৎ সবাই চলছে সেই অনন্ত গতির পথে। আজ এই থাক।

যারা সাগরের উপরে জাহাজে থাকে, তারা কোথায় যায়, নিজেরাও জানে না। compass-এর (কম্পাসের) যন্ত্র ঠিক করে নেয় কত ডিগ্রী। ঐ কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছে। compass-এর কাঁটা যেখানে পৌঁছাবে, তারাও সেখানে যাবে।

সেখানে (বীরভূমে)* যদিও অল্প কয়েকদিন ছিলাম, দীর্ঘদিনের কাজ করে এসেছি।

---

* এই গতিকেই উপনিষদে বলেছে, চরৈবেতি, চরৈবেতি।

* শ্রীশ্রীঠাকুর বীরভূম পরিক্রমা শেষ করে আসার পর এই ভাষণটি শ্যামবাজার ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ-এর বাড়ীতে দিয়েছিলেন।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

চঞ্চল মন অস্থিরতা নয়, মনের প্রসারতা

৪৬ নং ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কোলকাতা
৫ই মার্চ, ১৯৬১

সময় খুব অল্প। গলাটা ভেঙে গেছে। চক্র সম্বন্ধে দু'চার কথা বলছি। সা-রে-গা-মা-র ভিতর যেমন স্বরলিপি আছে; সেই স্বরলিপির সাধনা করতে হলে রাগরাগিনী সাধতে হয়। এই সা-রে-রা-মা-কে সাধনা করলে তাল, রাগরাগিনী যেমন থাকে গানে, তেমনই এই দেহেরও একটা স্বরলিপি আছে, শাস্ত্র আছে। অনেক চক্র আছে, তাতে মন্ত্র আছে। এই হ য ব র ল ইত্যাদির মতন অক্ষর আছে। চক্রের সমস্ত জায়গায় অনেক বর্ণ এবং রং আছে। এই সমস্ত লিখে নিয়ে ধ্যান করা আর হয়ে ওঠে না। মন্ত্র হচ্ছে স্বরলিপি মাফিক। এক স্বরলিপি সাধতে হলে এক 'সা'-তে অনেক দিন কেটে যায়। এক 'সা' সাধতে সাধতে কেবল 'সা' 'সা' করছি।

চক্রের সমস্ত জায়গায় অনেক বর্ণ এবং রং আছে। এই সমস্ত লিখে নিয়ে ধ্যান করা আর হয়ে ওঠে না। মন্ত্র হচ্ছে স্বরলিপি মাফিক। এক স্বরলিপি সাধতে হলে এক 'সা'-তে অনেক দিন কেটে যায়। এক 'সা' সাধতে সাধতে কেবল 'সা' 'সা' করছি।

একজন চিঠি লিখেছে, "এই চক্র সম্বন্ধে শাস্ত্রে যা আছে, তা বুঝা কঠিন। সহজ করে জানান যদি, একটু যদি বুঝিয়ে দেন, তাহলে খুব ভাল হয়।" তাকে লিখে দেওয়া হলো, গ্রন্থ পাঠ করে জানা একটা, আর সাধনা করে, চর্চা করে জানা আর একটা। একজন সঙ্গীতের সাধনায় 'সা'-'আ' 'আ' করছে, একটা গাভী হাম্বা হাম্বা করছে, একটা কাক কা কা করছে। প্রত্যেকেরই স্বরলিপি আছে। যে যার দেশে তার ভাবের চিন্তা করে কাজ (সাধনা) করছে বিভিন্ন ভাষায়। চায়নাতে একরকম করে বলছে। তুমি আর

একরকম করে বলছো। আমরা সবাই ছন্দে বা সুরে চলছি। এই জগৎটার স্বরলিপির ছন্দে সব সুরময় হয়ে যাচ্ছে। জীবনভর যে স্বরলিপির বা সা রে গা মা-র সাধনা প্রকারান্তরে করে চলেছি, এই সাধনা সবাই বুঝেই করেছে। সাধারণতঃ অনেকে গান শিখতে চায়, কিন্তু সাধনা করতে চায় না। স্বরগ্রাম নিয়ে আ-আ-করতে চায় না। সেটা তাদের কাছে বিরক্তিজনক, ভাল লাগে না। বলে, 'ভাল একটা গান শিখিয়ে দিন তো '। তারা সা রে গা মা সাধতে চায় না। কিন্তু ভিত্তি (ভিত) যখন পাকা হয়, ভিত্তিতে হ্যান ত্যান দিয়ে দেয়। তাতে ভিত্তির চেহারা ভাল হয় (কাঠামোটা শক্ত হয়)। কোন বাড়ীর ভিত্তির উপরই তলার পর তলা নির্ভর করছে। তলার পর তলা যে করবে, বাড়ীর ভিত্তিটা পাকা (শক্ত মজবুত) হওয়া চাই।

একটা ট্রেন যখন যাচ্ছে, যারা সুরজ্ঞ, তারা সেই তালে তাল দিচ্ছে। ট্রেণ সেও তার ছন্দের গতিতে চলে যাচ্ছে। ঘড়ির টিকটিক শব্দেও তারা তাল দিচ্ছে। সবটাই একটা সুর নিয়ে, ছন্দ নিয়ে চলছে। এই যে ঘোড়ার সকালবেলাকার দৌড়, সেটাও ছন্দে। ঘোড়া ছন্দে ছন্দে চলছে, টক টক করে চলছে। কি সুন্দর; তার লয় আছে, তাল আছে, ফাঁক আছে, সোম আছে। জীবনের গতি, চলার গতিতেই ছন্দ আছে। জীবন পৃথিবী ছাড়া নয়। পৃথিবী জীব ছাড়া নয়। আমাদের গতিটা যদি সেইভাবে সেই ছন্দে যায়, জগতের গতিটাও সেই ছন্দে চলতে থাকে, তবে অনন্তের গতি আমরা পাব। একজন এমনভাবে বসে আছে, একজন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, একজন এমনভাবে তাকিয়ে আছে, এসব কোন্ সুর? প্রত্যেকটির মধ্যেই গাঁথা আছে এক অন্তর্নিহিত সুর। গান গাইতে গাইতে ওস্তাদের আর পদ থাকে না, ত্যানা ত্যানা করছে। প্রথমে একটা শব্দ নিয়ে শুরু করলো। তারপর তাহাও থাকছে না। হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সুরে চলে গেছে, সুরে ডুবে গেছে। সুরে ডুবে থাকলেও দেখবে, হাত চলছে। এর ভিতর একটা গতি আছে। গান যে গায়, তার একটা গতি আছে। দেখবে, হাত, পা ছুঁড়ছে, গতির সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছে। একে Motion বলে। গতির সঙ্গে সঙ্গে গায়কের

জীবনের গতি, চলার গতিতেই ছন্দ আছে। জীবন পৃথিবী ছাড়া নয়। পৃথিবী জীব ছাড়া নয়। আমাদের গতিটা যদি সেইভাবে সেই ছন্দে যায়, জগতের গতিটাও সেই ছন্দে চলতে থাকে, তবে অনন্তের গতি আমরা পাব।

হাত, পা, মুখ, চোখ সব চলেছে। শব্দ করলো না। সুরটা বয়ে যাচ্ছে, 'বাঃ কি চমৎকার!' মুখে না বলে মনে মনে বলছে। মনে মনে চিন্তা করে সে এরকম করছে (হাত, পা-এর ভিতর দিয়ে চলেছে)। কিন্তু মুখে তার ভাবটা ফুটে উঠলো, 'বাঃ কি চমৎকার ফুল!' সাগর দেখে চিন্তা করছে, 'বাঃ কি সুন্দর।' দেখা যাচ্ছে, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিবস্তুতে সুরের ছন্দ, সোম, লয়, ফাঁক আছে এবং শব্দের আশ্রয় নিচ্ছে।

এই যে হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ করছে আবার বল হরি হরিবোল বলছে, শুনলেই বুঝা যায়, কোন্‌টি কীর্তনের শব্দ আর কোন্ শব্দে মড়া (মৃতদেহ) নিয়ে যাচ্ছে। মার খেয়ে দুঃখ পাওয়া তার কান্না একরকম। আবার 'মা মারা গেছে', বলে কান্না আরেকরকম। তাহাও সুরে বুঝা যায়। সুতরাং কান্নার সুরই মানুষকে জানিয়ে দেয় 'বাবা মারা গেছে', অথবা 'আত্মীয় মারা গেছে'। আবার মুখে কিছু না বললেও একজনের ভাবে গতিতে চিন্তাধারায় আরেকজন বুঝে নেয়। একজন গান গায়, একজন তবলা বাজায়, আর একজন খঞ্জনী বাজায়। সবাই তাল দিয়ে যাচ্ছে। 'আপনার কি হয়েছে বলুনতো' এই যে অবস্থাটা অন্যকে জানিয়ে দেয়। তাহলে জানিয়ে দেওয়ার যে অবস্থা, বস্তুর বস্তুত্বের মাঝেই আছে তার ব্যবস্থা। এরকম করলে ভগবান আসবেন, এরকম করলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, এরকম করলে অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তি আয়ত্তে আসে; সাধনার ক্ষেত্রে এরকম কথা কেন আসলো? সাধনা করলে অন্তর্যামিত্ব কিভাবে হয়?

মার খেয়ে দুঃখ পাওয়া তার কান্না একরকম। আবার 'মা মারা গেছে', বলে কান্না আরেকেরকম। তাহাও সুরে বুঝা যায়। সুতরাং কান্নার সুরই মানুষকে জানিয়ে দেয় 'বাবা মারা গেছে', অথবা 'আত্মীয় মারা গেছে'।

মনে কর, একজন এই মুখেই কাঁদছে, এই মুখেই হাসছে। একজনকে খবর দিল, তার ছেলে এ্যাকসিডেন্টে (accident) বাসের তলায় পড়ে হাসপাতালে গেছে। এতেই তার কান্না। মুহূর্ত্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেল। এই অজ্ঞান করতে হলে ক্লোরোফর্ম করতে হতো। কিন্তু একটি শব্দে অজ্ঞান হলো। কাজেই চিন্তার প্রভাবে মুহূর্ত্তে action (ক্রিয়া) হয়। সে অজ্ঞান হয়ে গেল, না পাগল হয়ে গেল, সেটা পরবর্ত্তী কথা। এই যে আঘাত নিয়ে

নেওয়া, এই যে আঘাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা এটা প্রাত্যহিক জীবনে প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই ঘটছে। একটা বাচ্চা শিশুকে যদি বলা যায়, 'বাবা মারা গেছে', সে হয়তো খুসী হবে। বাবাকে নিয়ে চলেছে আর 'ও' (শিশুটি) বলছে, 'আমিও যাব।' সূর্য রশ্মি ছড়িয়ে আছে। Powerful glass concentrate করলে তখন জ্বলে উঠবে। এই সূর্য রশ্মি হচ্ছে সুর। অবস্থাক্ষেত্রে অন্তর্যামিত্ব তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর কিছু না কিছু আছে। ভাবে, ব্যবহারে, আলাপে, কার্যকলাপে একটু আধটু বের হয়ে যায়। সকলের ভিতরেই এই শক্তি আছে। কাল হতে আজ আদরের ত্রুটি করে নাই। তবুও ফিরে এসে বলছে, 'যেন কাল হতে আজ একটু স্পর্শের অভাব দেখলাম। দেখি, বুঝতে পারি কি না কেন এমন করলো।' সবাই বুঝে নিতে চায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন কেন করতে করতে একটু একটু বুঝা যায়। বাড়ীতে এসে একজন বললো, 'এমন একটা ব্যবহার পেলাম, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।' অনেকক্ষেত্রে অনেকে বুঝে নিতে পারে। আবার অনেক সময় ভুল হয়। যাইহোক, এই বুঝাবুঝির মধ্যেই সবাই আছে। এই যে ভাব, এই ভাবকেই বাড়াতে বাড়াতে যেতে হয়।

অবস্থাক্ষেত্রে অন্তর্যামিত্ব তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর কিছু না কিছু আছে। ভাবে, ব্যবহারে, আলাপে, কার্যকলাপে একটু আধটু বের হয়ে যায়। সকলের ভিতরেই এই শক্তি আছে।

মনে কর, এক গ্লাস সাগরের জল, সেতো সাগরেরই জল। দেখা গেল, অগণিত এই গ্লাস, ৫০০ কোটি গ্লাস, ৫০০ লক্ষ কোটি গ্লাস, আরও আরও কত কত কোটি গ্লাস জল ঢালতে ঢালতে এই সাগর হয়েছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সবকিছুই যেন বিরামবিহীনের গান গেয়ে চলেছে। অনেকে আবার একটু একটু অনুভব করতে পারছেন। হ্যাঁ, তিনি এখন টালিগঞ্জ থেকে বেরোচ্ছেন। এখান থেকেই তিনি এটা বুঝতে পারছেন। কারণ একটা থাকলে আর একটা থাকবেই, এটাই নিয়ম। কাজেই আমরা যে সুরের চর্চা

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সবকিছুই যেন বিরামবিহীনের গান গেয়ে চলেছে। অনেকে আবার একটু একটু অনুভব করতে পারছেন। হ্যাঁ, তিনি এখন টালিগঞ্জ থেকে বেরোচ্ছেন। এখান থেকেই তিনি এটা বুঝতে পারছেন। কারণ একটা থাকলে আর একটা থাকবেই, এটাই নিয়ম। কাজেই আমরা যে সুরের চর্চা করছি, তা হতেই আগুন হয়, বৃষ্টি হয়।

করছি, তা হতেই আগুন হয়, বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হওয়ার একটা কারণ আছে। একটা রাগরাগিনীকে অবলম্বন করে বৃষ্টি হয়। সূর্যের রাগরাগিনীতে ঝড় বাতাসের সৃষ্টি হয়। সূর্যের সৃষ্ট পৃথিবী, পৃথিবীতে সৃষ্ট আমরা। কাজেই যে রাগরাগিনীতে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, সেই রাগরাগিনী আমাদের মধ্যেও থাকবে।

সূর্য হতে যে রাগরাগিনী বের হয়েছে, তার রূপ এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ। শুধু ৫০টা যন্ত্র নিয়ে যদি তাল দেওয়া হয়, দেখা যাবে তারা একই সুরে মিলিত হচ্ছে। ভিতর দিয়ে দিয়ে এই জল, পর্বত সকল ছন্দোময় অবস্থায় নূতন নূতন সৃষ্টি করে গেছে। তারা সকলেই সূর্যের রাগরাগিনীর চর্চা করে যাচ্ছে। এই অপরূপ রূপের ভিতর দিয়ে যে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, ইহা অদ্ভুত। গায়কেরা বলে বলে তাল দিচ্ছে। এরকম আর একজন, 'এ হে', 'বারে বাঃ', 'অদ্ভুত', সব বলছে। এক একটা সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সবাই অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। 'বা রে বাঃ'। কয়েকটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছেনা। সাগর দেখে মুগ্ধ হয়ে কবিরা তার সুরটা লিখে গেছে। যে রাগরাগিনী হতে এই ছন্দ বের হয়েছে, যা হতে শিবশক্তির সৃষ্টি হয়েছে, এই শিবশক্তি তোমাদের ভিতর আছে। এই শিব হতেই আবার নূতন নূতন রাগরাগিনী আসে। প্রলয়ের ভিতর দিয়ে অদ্ভুত সুর দিতে থাকে। যে রাগরাগিনী হতে এই জগৎ জীবের সৃষ্টি, আমাদের সৃষ্টি, তার ভিতর (সৃষ্ট বস্তুসমূহের ভিতর) রাগরাগিনীর সব ক্ষমতা আছে। জীবলোকে সমস্ত কীটপতঙ্গ সবাই যদি সেই রাগরাগিনী হতে সৃষ্টি হয়, তবে সকলের ভিতরেই সেই রাগরাগিনীর ক্ষমতা আছে। সিংহত্ব সবারই আছে। সিংহের বাচ্চা সিংহই হবে। সাময়িকভাবে ভেড়ার পালে মিশে ঘাস খেতে পারে, রক্তের স্বাদ পেলেই আবার সিংহত্ব ফিরে পাবে। আমাদের পরিবেশের জন্য অবস্থা ক্ষেত্রে সংস্কারের বেড়াজালে পড়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। কিন্তু যদি রক্তের স্বাদ পাই, তবে সূর্যের ক্ষমতা আমাদের মাঝে জেগে উঠবে। সূর্যের রাগের (রাগরাগিনী) বীজ যদি প্রতিটি

জীবলোকে সমস্ত কীটপতঙ্গ সবাই যদি সেই রাগরাগিনী হতে সৃষ্টি হয়, তবে সকলের ভিতরেই সেই রাগরাগিনীর ক্ষমতা আছে। সিংহত্ব সবারই আছে। সিংহের বাচ্চা সিংহই হবে।

বস্তুতে থাকে এবং সুরের ক্ষেত্রে আমরা যদি তা বপন করি, আপনি ফুটে উঠবে। বিরাট মহীরুহে (বৃক্ষে) পরিণত হবে। সেই বৃক্ষে থাকবে অনিমা, লঘিমার অনন্ত শক্তির ধারা। কারণ ধারা হতে ধারা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সব এসেছে। সিংহ ঘাস খেলেও মাঝে মাঝে ছুটফাট করছে, নিজের মধ্যে নিজে ভীষণ জ্বালাতন বোধ করছে। কুকুরের দলের মধ্যে পড়ে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে। আবার ভাবছে কুকুর যদি কামড়ে দেয়। আমরাও সেইরূপ কপাল, ভাগ্য, হবে না, কি জানি, ভাগ্যফল, কর্মফল, তাঁর ইচ্ছা, এসব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এগুলোই হচ্ছে আমাদের খোরাক। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন যদি শুধু দেখতে থাক, আর সব অক্ষর যদি উঠিয়ে নেই, কিরকম হবে বলো তো? আবার এগুলোর প্রয়োজন আছে। জীবনটার মধ্যেও এরকম। একটা লোক দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়ি হয়ে গেল। আর একজন লিখছে, 'বাবা পাঁঠা'। কারণ দাঁড়ি নেই, কমা নেই। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন না থাকলে কারও সঙ্গে কারও মিল থাকবে না। তাহলে কার সর্বনাশ করে ফেলবে, ঠিক নেই। এগুলো (দাঁড়ি, কমাগুলো) চেক (check) করে রেখেছে। গাড়ী চলেছে। সামনেই লেখা Caution (সাবধান)। কাজেই আস্তে ধীরে slow drive করতে হয়।

এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার এক ঠ্যাং ছিল। পরে আর একটা ঠ্যাং গেছে। ফলে বাচ্চারা ভূতপ্রেতের ভয়ে এঘর হতে ওঘর যেতে পারে না। কলাগাছ দেখে বলে, একটা বউ ডাকছে। প্রতিটি মন্ত্রের তেজ আছে তো। খুব কম ব্যক্তিই আছে অন্ধকারে এঘর থেকে ওঘরে যেতে ভয় না পায়। ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। মনে হয়, খালাস হলো। কিন্তু এতে যে কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল, বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সময়ও দেখছে, হাঁ করে কিষ্কিন্ধ্যা (রাক্ষস) গিলতে আসছে। এই ভয়ে ভয়ে রক্ত কণিকাতে এ্যালার্জি হয়ে যায়। চিংড়ি মাছ খেলে যেমন অনেকের লাল হয় শরীর, সেরকম। আমাদের জীবনটা হয়েছে কি, নানা কথাবার্তায়, 'হতাশ জাতীয়' বা না হওয়ার কথাবার্তায়', এই রাগরাগিনীতে সব গোলমাল হয়ে

ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। মনে হয়, খালাস হলো। কিন্তু এতে যে কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল, বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সময়ও দেখছে। হাঁ করে কিষ্কিন্ধ্যা (রাক্ষস) গিলতে আসছে। এই ভয়ে ভয়ে রক্ত কণিকাতে এ্যালার্জি হয়ে যায়।

গেছে। কাজেই রাগরাগিনী হতে রাগিনী নষ্ট হয়ে গেছে। জীবনের গতিও অন্যরূপ হয়ে গেছে। এখন রাগিনী নেই। রাগটা শুধু আছে, মেজাজটা আছে।

সূর্য তাঁর অফুরন্ত তেজোভান্ডার হতে যে তেজ দান করে যাচ্ছেন, তাতেই জগতের সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে সেই তেজ তিনি দান করে যাচ্ছেন। এতেই জগৎ ভরপুর হয়ে আছে। এই যে দেহের ৯৬° ডিগ্রী, ৯৭° ডিগ্রী তাপমাত্রা, এটা সেই সূক্ষ্ম তেজ। একটা তাপ থাকলে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেই যথেষ্ট। একটা প্রদীপ জ্বালালে তার থেকে অগণিত প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। এই তাপ যা আমাদের মধ্যে জ্বলছে, সূর্য হতেই এই তাপ। এই যে রাগরাগিনী চলছে, এটা সূর্যেরই রাগ। এই যে পরিদৃশ্যমান জগতে এত রূপে রূপে রূপান্তরিতের মেলা, এটা সূর্যেরই রূপ। সুপ্ত যে রাগরাগিনী, তাই অভিব্যক্ত হচ্ছে নানাভাবে নানারঙ্গে। একজন বাসন মাজছে, একজন ঝাড়ু দিচ্ছে; যে যার আপনমনে আপনি সুর দিয়ে যাচ্ছে। যে গান গায়, সে যেমন হোক, আপন মনে গাইছে। একটা বাচ্চাও গান গায়। এটা কিভাবে হচ্ছে? কেন? এর কারণটা হচ্ছে, যে রাগরাগিনী হতে আমরা সৃষ্ট হয়েছি, সেটাই ধিতাক ধিতাক করে উৎরিয়ে দিচ্ছে। একটা শেফালী ফুলের বীজ হতে শেফালী গাছের সৃষ্টি। এই গাছ ঝাঁকি দিলে হাজার হাজার খই-এর মত শেফালী ফুল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, যা তুমি কুড়িয়ে শেষ করতে পারবে না। একটা বীজের এত ক্ষমতা। সেই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন রাগরাগিনী আমাদের মধ্যে পড়ে পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। যদি তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো না যায়, গাছ যেমন শুকিয়ে যায়, তোমাদের বীজও শুকিয়ে যাবে। কিভাবে আমাদের মধ্যে চলেছে? কাম, ক্রোধ, শয়তানি, দুষ্টামি সব ঝাঁকি দেওয়া ফুল পড়ে যাচ্ছে। কত মিছে কথা, কতরকম অভিনয়, এগুলোর মধ্যে সব সুর আছে। বাড়ীর বউকে একরকমভাবে বকছে। আবার ঝি-এর সঙ্গে যে ঝগড়া, সেটা আরেক রকম। বাবার সঙ্গে ঝগড়া না হলেও, কথাবার্তাগুলি তুমি আমি আপনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, ভাব ও ভাষা বিভিন্ন। সব তালে তালে চলছে। রাগরাগিনী উথলে পড়ছে। এই ফেনা

সেই অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন রাগরাগিনী আমাদের মধ্যে পড়ে পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। যদি তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো না যায়। গাছ যেমন শুকিয়ে যায়, তোমাদের বীজও শুকিয়ে যাবে।

সাগরেই ভাসে। এগুলিই আমাদের রাগরাগিনীর স্বরলিপি।

সূর্য থেকে যে রাগরাগিনী বের হচ্ছে, এখন সূর্যেই যা দেখা যাচ্ছে, তারই স্বরলিপি জানা দরকার। জীব, জন্তু, জানোয়ার সবাই সুরে মাতোয়ারা। একটা কাকের ডাকে কয়েকশত কাক উড়ে আসবে। আজপর্যন্ত জীবলোকে যতগুলি অগণিত জীবের সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিটি জীবের বাহ্যিক সুরগুলো প্রতিটি জীবের ভিতর সম্পূর্ণভাবে আছে। পৃথিবীর যে রাগরাগিনী সমস্ত জীবেরও একই রাগিনী। কারণ সমস্ত জীবলোক পৃথিবী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। চেহারা বিভিন্ন, হাঁটাচলা ভিন্ন; এতগুলো সুর প্রত্যেকের ভিতর আছে। কাজেই অনন্ত সুরের সুর যদি প্রতি জীবে থাকে, তাহলে প্রতিজীবের ভিতর সমস্ত জীবলোকের সুর আছে। তাই চিন্তার প্রভাব এত। মন এত চঞ্চল। এটা মনের অস্থিরতা বা চঞ্চলতা নয়; এটা মনের প্রসারতা, ব্যাপকতা। সূর্যে যেমন জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড আছে, আমাদের ভিতরেও তেমনি রাগের রাগিনী, সুরের কুন্ড আছে। সূর্যের রাগরাগিনীর সঙ্গে আমাদের রাগরাগিনীর সম্বন্ধ আছে। তা যদি চর্চা কর, আপনমনে বাজাতে থাক, দেখবে আপনি ফুটে উঠবে। সূর্যের মত আমাদের মধ্যে যন্ত্রের মত কিভাবে সাধা দরকার, কিভাবে অন্তর্যামিত্ব, অনিমা, লঘিমা হয়, কিভাবে ঝড় আসে, জানবে যখন তখন দেখবে, 'বাঃ কি সুন্দর।' কিভাবে মনকে স্থাপন করলে কোন্ কোন্ চিন্তায় কিভাবে কি হয়, সব জানতে পারবে। তখন আর এক জগতের আর এক ভাবের সন্ধান পাবে। সব বুঝতে পারবে।

মন এত চঞ্চল। এটা মনের অস্থিরতা বা চঞ্চলতা নয়; এটা মনের প্রসারতা, ব্যাপকতা।

কিভাবে মনকে স্থাপন করলে কোন্ কোন্ চিন্তায় কিভাবে কি হয়, সব জানতে পারবে। তখন আর এক জগতের আর এক ভবের সন্ধান পাবে।

রাত্রি হয়ে গেছে। সেটা সামনের দিন বলবো। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই কাম

বীরভূম জেলার নবসন গ্রামের সভা
৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৭, শনিবার
(১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১)
বিকাল ৩-৫০মিঃ হইতে ৪-৩০মিঃ

আজ ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে। তোমাদের আদিবেদের কথা বলছি, মন দিয়ে শোন। ধর্মের অর্থ বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে জাতিগত বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম কি, তা আগে জানা দরকার। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত জীব জগতের এক ধর্ম। আজ এই ধর্মে এত জাতিভেদ কেন? ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করার জন্যই দেশের ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে। সূর্য যেমন সকল জীবের জন্য, পৃথিবী যেমন সকল জাতের জন্য, ধর্মও তেমনি সকল জীবজাতির জন্য। ধর্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। ধর্মে কোন জাতপাত থাকবে না। ধর্মে কোন বিরোধিতা থাকবে না। আজ আমাদের দেশের ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে। শিশুবয়স থেকে যা জেনেছি, যা বুঝেছি সকলকার ভিতর তা জানিয়ে দিচ্ছি।

ধর্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। ধর্মে কোন জাতপাত থাকবে না। ধর্মে কোন বিরোধিতা থাকবে না। আজ আমাদের দেশের ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে।

ধর্ম আর সত্য আলাদা বস্তু নয়। কাম কাঞ্চনে ধর্ম নষ্ট হয় না। পর্বতে একটা সভা হয়েছিল। সেখানে ১০০/২০০/২৫০ বছর বয়স সেইসব সাধক মহাপুরুষদের। সেখানে প্রত্যেকের নিজ নিজ কথা বলার অধিকার ছিল। কাম, ক্রোধ, কাঞ্চন, মায়া, মোহ ইত্যাদি থাকলে ধর্ম হয় কি না, এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। অনেকের মতে কাম, ক্রোধ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ধর্ম হবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়রিপু ত্যাগ করতে হবে। আর দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বৃত্তিগুলি থাকবে, ততক্ষণ ধর্ম হবে না।

আমার কথা হল, সবকিছুই যখন ছাড়তে ছাড়তে শ্মশান পর্যন্ত যাব, তবে নূতন করে আবার কি ছাড়বো? আমাকে ২০ মিনিট সময় দিল বলার জন্য। আমি বলতে শুরু করলাম, "কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ইত্যাদি ষড়রিপু কখনও ত্যাগ হয় না। ভগবানকে ডাকাও কাম। এই যে একটি ফুল দেখে বললে, 'বা চমৎকার।' চক্ষু ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি; কাম হয়ে গেল। কাম হচ্ছে ইচ্ছাশক্তির সাড়া; ভগবানকে ডাকছি, এটাও কাম। সুতরাং কামত্যাগ হয় না কখনও। যে ত্যাগের কথা শুনে আসছো, তা ত্যাগ হয় না। যেনারা (যাঁরা) ত্যাগ ত্যাগ বলে গেছেন, তাঁদের পাহাড়, পর্বত, সাগর ভাল লাগতো না? এতেই সঙ্গম হয়ে গেল। চোখে দেখে, কানে শুনে ভাল লাগলে সঙ্গমই হয়ে গেল। চোখে দেখে তৃপ্তি, কানে শুনে তৃপ্তি কাম। তৃপ্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি। কান তো লিঙ্গ, চক্ষুও লিঙ্গ, সবই লিঙ্গ। পরম তৃপ্তি বা দেহের তৃপ্তিই সব ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য। তুমি যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির কথা বল, তা ঠিক নয়।"

আমি সমসুরে একই সুর দিয়ে যাচ্ছি। একটা তৃপ্তিই, পরম তৃপ্তি, যেখানে কোন ছাড়াছাড়ির কথা আসে না। সেই পরম তৃপ্তি, শিবশক্তির মিলন। সেখানে পরম সঙ্গমেরই কথা, একই তৃপ্তি। কাম কখনও বর্জন হতে পারে না। 'ত্যাগ করেছেন' যারা বলেন, সেটা শুধু মুখের কথা। কেউ ত্যাগ করতে পারেনি। জীব সমস্ত অবস্থার সহিত যে যুক্ততায় রয়েছে, সেটাই কাম। তাহলে তো কারও ত্যাগ হতে পারে না। দেহের সমস্ত বৃত্তি অক্ষুন্ন রেখেই তুমি দর্শন করছো, শ্রবণ করছো, জিহ্বায় স্বাদ গ্রহণ করছো। ডাক্তার যে Mixture তৈরী করে, তার ভিতর সাপের বিষ থাকতে পারে। কাম, ক্রোধ, লোভ যা Mixture মাফিক; মাত্রা মাফিক Mixture. আমরা সেই মাত্রারই সাধনা করছি। সাপের বিষ এতুটুকুতে খারাপ হতে পারে। কিন্তু একটু তোমার প্রয়োজন ছিল। কেউ একবোতল Mixture খেলে মারা যেতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনে এতটুকু থাকলে কোন

সেই পরম তৃপ্তি, শিবশক্তির মিলন। সেখানে পরম সঙ্গমেরই কথা, একই তৃপ্তি। কাম কখনও বর্জন হতে পারে না। 'ত্যাগ করেছেন' যারা বলেন, সেটা শুধু মুখের কথা। কেউ ত্যাগ করতে পারেনি। জীব সমস্ত অবস্থার সহিত যে যুক্ততায় রয়েছে, সেটাই কাম।

ক্ষতি হয় না। ১ পাই এক লক্ষ ছাড়া নয়। কাজেই সবটা নিয়েই ব্রহ্ম। এখানে বাদাবাদির কথা থাকতে পারে না। এখানে ধর্মকে সীমাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে রেখে দিয়েছে।

আমার ধর্ম গন্ডীতে নয়। আমার ধর্ম ব্যাপকতার সুরে ভরা। এখানে এসেছি। তোমাদের দেশে (পর্বতে) এসে খুব খুশী হয়েছি। আমরা ঘরছাড়া, বাড়ীছাড়া, গতিছাড়া, অর্থকষ্টে আচ্ছন্ন; তবু চেষ্টা করছি, সূর্যের আলো যাতে একটু ভিতরে আনা যায়। মুক্ত বায়ুকে কিভাবে ঘরে বাইরে এক করা যায়, বন্ধ ঘরকে কি করে মুক্ত অবস্থায় রাখতে পারি; জানালা দরজার সংখ্যা আরও বেশী করে দিয়ে আরও মুক্ত অবস্থায় যাতে মিলিয়ে দিতে পারি, তার জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই মুক্ত মনকে একাকার করাই আমাদের কাজ। ধর্মের নীতিগত অবস্থাকে একাকার করাই আমাদের কাজ। আর কিছু করার দরকার নেই।

সূর্যের আলো যাতে একটু ভিতরে আনা যায় মুক্ত বায়ুকে কিভাবে ঘরে বাইরে এক করা যায়, বন্ধ ঘরকে কি করে মুক্ত অবস্থায় রাখতে পারি; জানালা দরজার সংখ্যা আরও বেশী করে দিয়ে আরও মুক্ত অবস্থায় যাতে মিলিয়ে দিতে পারি, তার জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছি।

পাহাড়ের সেই বয়স্ক সাধকেরা আমার কথা শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত আমার মত মেনেও নিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ‘‘এই বাচ্চা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানে। আমরা তাঁর যুক্তি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলাম।’’ আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সিদ্ধিলাভ তাঁরই হয় সহস্রারগামী যাঁর দৃষ্টি

শ্যামবাজার, ৪৬ নং ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, কোলকাতা
২.৩.১৯৫৭

একটা ভাবেই সবসময় যে ভাব আছে, সেই ভাব থেকে ভাবের সৃষ্টি হয়। একটা ভাবই যে ভাব থেকে তুমি এসেছ, সেই ভাব হতে ভাবের সৃষ্টি। ভাবাতীত ভাবে বিভোর ভাবে তন্ময় ভাবেই সব। এই ভাব, এই তন্ময়তা, এই চিন্তা দৃষ্টির বাইরেও রয়েছে দিগন্তে ভাবসাগরে। ভাবের যে সাগর সেখানে খায় হাবুডুবু, সেখানে সাঁতার, সেখানেই বিচরণ। এই ভাব গভীরতমে বিরাজমান। এখানে অঙ্কুর আছে। এর গাছ আছে, এর পাতা আছে। ইহা সবসময় ভিতরে আছে। তবে বিক্ষিপ্ততা কেন? যেখানে তন্ময়তায় বিভোর, সেখানে বিক্ষিপ্ততা শুনতে মোটেই সুন্দর নয়। যেভাবে থাকবে চিত্ত স্থির, সেখানে বিক্ষিপ্ততা কেন? তাহলে তো ভাবের গভীরতায় ভাবনা হলো না। ভাবে চিত্ত যখন হলো বিভোর, এই বিক্ষিপ্ততা কিভাবে আছে? এর ভিতর কি ভাব নেই? যদি বিক্ষিপ্ততার মধ্যে ভাব না থাকে, ভাব যদি এই বিক্ষিপ্ততাতে ভাবনা না করে, তবে ভাব ভাবনার পাল এড়িয়ে বিক্ষিপ্ততার মধ্যে স্বয়ং বিচরণ করে।

ভাবের যে সাগর সেখানে খায় হাবুডুবু, সেখানে সাঁতার, সেখানেই বিচরণ। এই ভাব গভীরতমে বিরাজমান। এখানে অঙ্কুর আছে। এর গাছ আছে, এর পাতা আছে। ইহা সবসময় ভিতরে আছে।

মন যদি এই বিক্ষিপ্ততার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে কি বুঝা যাবে? যে ভাব হতে, যে ভাবনা হতে স্রষ্টা এই বিশ্বরূপ সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাব আমাদের ভিতরে থেকে ভাবনা করে চলেছে। ছেড়ে দেওয়া যদি রীতিতে থাকে, তবে নীতি বিরোধিতা কিছুই করে নাই। তা হলে এই বিক্ষিপ্ততা নীতিতেই আছে। আর যদি বল, ভাব ভাবনার বাইরে আপনমনে বিক্ষিপ্ততা দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি বলবে বল? চিত্ত যদি সে আপনমনে নিজমনে বাচ্চাশিশুর ন্যায় খেলতে খেলতে এদিক ওদিক ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে (চিত্ত) যদি তার নিজের খেয়ালের বশে বইতে থাকে, তাহলে ওকে কোন্ অবস্থা বলা যেতে পারে? তার আপনগতি, এটা খেয়ালীর খেলা; চিত্ত যদি শিশুর ন্যায় খেয়ালের মধ্যে থেকে থাকে, তবে এটা খেয়াল নয়, এটা খেয়ালীর খেয়াল। খেয়ালী যদি খেয়ালে পৌঁছে, তবে পুরোপুরি খেয়ালের দিকেই যাচ্ছে বলে সেটা মেনে নিতে হবে।

যেদিক দিয়েই যাই না কেন, আমাদের হতাশ নিরাশ হওয়ার কোন কারণ থাকে না, যদি তার মধ্য থেকে বুঝটুকু নিতে পারি। ভাবনার মাঝে যদি বিক্ষিপ্ততা থেকে থাকে, তবে বলতে হবে খুব হুঁশিয়ারের ন্যায় চলেছে, এতটুকু বেহুঁশ হয় নাই। এরমধ্যে ভাব পুরোপুরিই আছে। ভাব পুরোপুরি থাকলে মন পরিপূর্ণ আছে। সেই পরিপূর্ণ অবস্থায় মন পরিপূর্ণ থাকতেই চেষ্টা করে। এই পরিবর্ত্তনশীল যে জগৎ, তার মাঝে, ক্ষণিকের পরিবর্ত্তনের মাঝে যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি তার মাঝে চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি পাচ্ছি। এই ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি নিবৃত্তির উন্মাদনায় ছিটকানি খাচ্ছে। এই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে ক্ষণিকের বৃত্তিতে মাঝে মাঝে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। জাগতিক জীবনে এই যে নানারূপ অবসাদ পূর্ণ বার্ত্তা, ইহা ক্ষণিকের পরিবর্ত্তনশীল জগতের মাঝে পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা শুধু। আমাদের ভিতর একরকম ফোয়ারা রয়েছে। ঠিক ফোয়ারা নয়। গ্রামদেশে যাকে বলে ‘ফুয়ারা’। এই যে অবস্থা হচ্ছে, দুঃখ, আঘাত আসছে, নিজেকে পাপী তাপী ইত্যাদি নানারকম ভাবছে, মনের এই যে চাঞ্চল্যকর অবস্থা, এগুলো ফোয়ারা জাতীয়। এর প্রবল স্রোত যখন বইতে থাকে তখন যেমন ছিটকা

ভাবনার মাঝে যদি বিক্ষিপ্ততা থেকে থাকে, তবে বলতে হবে খুব হুঁশিয়ারের ন্যায় চলেছে, এতটুকু বেহুঁশ হয় নাই। এরমধ্যে ভাব পুরোপুরিই আছে। ভাব পুরোপুরি থাকলে মন পরিপূর্ণ আছে।

প্রবল স্রোতের যে স্রোত বয়ে চলেছে, সেটা হচ্ছে মন আপন বেগে পুরোপুরি পরিপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য এখন চলেছে। তারমধ্যে সীমাবদ্ধের সৃষ্টি ছিটকে পড়ছে। তখন মনে হয় মন চঞ্চল হয়ে গেছে।

আসে, সেইরূপই ইন্দ্রিয়ের ভিতর এইসব ছিটকায়। আমাদের ভিতরে প্রবল স্রোতের যে স্রোত বয়ে চলেছে, সেটা হচ্ছে মন আপন বেগে পুরোপুরি পরিপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য এখন চলেছে। তারমধ্যে সীমাবদ্ধের সৃষ্টি ছিটকে পড়ছে। তখন মনে হয় মন চঞ্চল হয়ে গেছে। বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে ছিটকানি। সাময়িক ছিটকা রোগ বড় রোগ। সাময়িক এটা বড় অসুবিধার সৃষ্টি করে, বড় জ্বালা দেয়। এই ছিটকা রোগ যখন জ্বালা দিতে থাকে, অন্য সব ভুলে যেতে বসে।

তোমরা দৃষ্টি সবসময় ঠিক রাখবে। ভাব যখন ভাবনা করছে, ছিটকা রোগ হচ্ছে ক্ষণিকের মেঘ। সূর্যকে মেঘ সাময়িক ঢেকে রাখে বটে, কিন্তু সূর্যের সাথে মেঘের অনেক ব্যবধান। সূর্য পরম বৃহৎ, বৃহদাকার। সূর্যের সাথে মেঘের কোন তুলনাই হয় না। তোমরা সূর্যকে ভুলেও ক্ষুদ্র চিন্তা করে বসো না। এই যে মেঘ, ইহা ভিতরকার সূর্যকে (তাপ, তেজ বা জ্ঞানকে) সাময়িক ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু কখনও সূর্যকে চির আবরণে আবৃত করে রাখতে পারে না। যাকে ঢেকে মেঘ তুই বাহাদুরি করছিস, তার প্রতাপেই তোর প্রতাপ। আমার (সূর্যের) প্রতাপেই তোর প্রতাপ। আবার আমাকেই করছিস উপহাস। আমাদের ছিটকানো মেঘগুলো অপরূপ সূর্যকে উপহাস করছে। ছিটকানো দেখতে লোভ লাগে, চোখে দেখে ভাল লাগে। কিন্তু জিহ্বায় দিলে স্বাদ মোটেই সুন্দর নয়। ছিটকানোতে বুঝা যায় Fog (কুয়াশা), এর ছিটকা পড়লো। বুঝা যায় এবার শীত পড়বে। ছিটকানো বুঝিয়ে দিচ্ছে একটা কিছু আসবে। সেইরূপ আমাদের মনের ছিটকানো অবস্থা, বিক্ষিপ্ত অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে, যে জিনিস আসছে, ইহার প্রবল ভাব, প্রবল মন, প্রবল বেগ সাগরের দিকে চলেছে। এর ভিতরে ফুল, ফল হচ্ছে। ক্রোধ, রাগ, হিংসা, দ্বেষ ফলছে। এগুলো সাময়িক চমৎকার মনে হলেও

এই যে মেঘ, ইহা ভিতরকার সূর্যকে (তাপ, তেজ বা জ্ঞানকে) সাময়িক ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু কখনও সূর্যকে চির আবরণে আবৃত করে রাখতে পারে না। যাকে ঢেকে মেঘ তুই বাহাদুরি করছিস, তার প্রতাপেই তোর প্রতাপ।

তোমার দেখবার নয়। এই চমৎকার কোথাকার ঈপ্সিতা? কোন্ ঈপ্সিতের ঈপ্সিত? মনের যে প্রবল ভাব চলেছে, প্রবল বন্যা চলেছে, ইহা হচ্ছে তারই ঈপ্সিত। আমরা ক্রোধ ঈপ্সিত পাইতেছি, লোভ ঈপ্সিত পাইতেছি, কাম ঈপ্সিত পাইতেছি, মাৎসর্য ঈপ্সিত পাইতেছি। তাহা হইলে আমরা (মনের ছিটকানো অবস্থায়) ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) সাথে সাথে ভগবানের ঈপ্সিতও পেয়ে যাচ্ছি। এই দুনিয়া ঈপ্সিতেই চলেছে। খুব খারাপ অবস্থায় পর্যন্ত এই ঈপ্সিতই কাজ করে। কতরকম ঈপ্সিত যে চলেছে। ঈপ্সিত ছাড়া চলবে না। প্রত্যেকের দেহে মনে 'আমির' আমিত্বের ভিতর ঈপ্সিত, চোখের ভিতর, দৃষ্টির ভিতর ঈপ্সিত, সৃষ্টিতেই ঈপ্সিত। ইহা যে ঈপ্সিতই, এর মাঝেই চলেছে গতির ধারা। এক একটা রাজত্বে, ভগবানের বহু বড় বড় গোডাউনে (গুদামে) আছে এক এক ধরণের ঈপ্সিত। stock হতে মাল বোঝাই করার জন্য এখানে কিছু নমুনা দিয়ে দিয়েছে। কোন্ ঈপ্সিতটি তুমি গ্রহণ করবে, সেটা বুঝে নিতে হবে। এই সাড়া, এই ইঙ্গিত সবসময় আমাদের ভিতর চলেছে। এত বড় হীরা, এত মূল্যবান হীরা কয়লার ভিতর লুকিয়ে থাকে। আমরা সেইরূপ কয়লার খনিতে আছি। সেখান হতে হীরা বের করতে হবে।

এই দুনিয়া ঈপ্সিতেই চলেছে। খুব খারাপ অবস্থায় পর্যন্ত এই ঈপ্সিতই কাজ করে। কতরকম ঈপ্সিত যে চলেছে। ঈপ্সিত ছাড়া চলবে না। প্রত্যেকের দেহে মনে 'আমির' আমিত্বের ভিতর ঈপ্সিত, চোখের ভিতর, দৃষ্টির ভিতর ইপ্সিত, সৃষ্টিতেই ঈপ্সিত।

পৃথিবী প্রথমে গলিত পদার্থ ছিল। নিয়ম হলো গলিত পদার্থ একজায়গায় জমে থাকতে থাকতে তার থেকে বাষ্প, ধোঁয়া, জলের সৃষ্টি হয়। আমাদের ভিতর সেইরূপ গলিত পদার্থ আছে। জল বের করতে হবে। যুদ্ধের সময় এক গ্লাস জল ১০টাকা দিয়ে খেয়েছে। এই জল সে নিজেই এসেছে। এই গলিত পদার্থ এসে ধোঁয়ায় পরিণত হল। একেবারে পাকানো ধোঁয়া, মানুষ হেঁটে যেতে পারে। তা গলে জল হয়ে গেল। স্রোত বইতে

আমাদের মনের মধ্যে এইরূপ Fog আছে। মনের প্রশস্তি যতদূর, মনের ব্যাপকতা যতদূর, মন যতদূর ততদূর কুয়াশা। এই Fog নষ্ট হয় তেজে। জ্ঞান সূর্য যখন এই Fog এর উপর পড়ে, তখন কুয়াশা সরে যেতে বাধ্য হয়।

লাগলো। লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে স্রোতে স্রোতে দেশ দেখা দিল। মাঝে জীব, গাছপালা, গলিত পদার্থ, ধোঁয়া সৃষ্টি হল। সেখানে আবার Fog (কুয়াশা) দেখা দিল। আমাদের মনের মধ্যে এইরূপ Fog আছে। মনের প্রশস্তি যতদূর, মনের ব্যাপকতা যতদূর, মন যতদূর ততদূর কুয়াশা। এই Fog নষ্ট হয় তেজে। জ্ঞান সূর্য যখন এই Fog এর উপর পড়ে, তখন কুয়াশা সরে যেতে বাধ্য হয়। রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য হচ্ছে গলিত অবস্থায় ধোঁয়ার আকার। সব সৃষ্টির বীজ এখানে আছে। নব নব রূপই হচ্ছে বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ বর্ণনার মাঝে অবর্ণনীয় হয়ে রয়েছে।

আজও এই Fog চলেছে। বাড়ী, ঘরদোর, আশা আকাঙ্খা চলছেই। এই 'আমার বোধ' একদিন শেষ হয়ে যাবে। যখন শেষ হতে থাকে, তখন বুঝা যায়, 'আমার ঘর, আমার বাড়ী, এই আমার ঠিক নয়। আবার এরও দাম আছে। আমার আমিকে খুঁজতে গেলে আমাকে পাবে না। আমার আমিকে কোথাও পাচ্ছি না। নিজের ভোগের মাঝে যখন যাবে, তখন 'আমার বোধ' তোমার কাছে বড় বলে মনে হবে। এটা হচ্ছে সুপ্ত সাড়া। সৃষ্টির অগণিত রূপ 'আমার' খোঁজ করার সাথে সাথে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। নূতনত্বের মাঝে নিজের আমিত্বকে পেতে চাচ্ছে আর সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সেইদিন খুঁজে পাবে আমার আমিকে, যেদিন সব collapse করে যাবে। তাই প্রবল চাহিদার (ঈপ্সিতের) মাঝে জীব আজও নিজেকে খুঁজে চলেছে। যাওয়ার সময়ও (অন্তিম সময়ে) বলে যাচ্ছে, 'আমার বাড়ীটা দেখিস্, আমি যাচ্ছি।'

সেইদিন খুঁজে পাবে আমার আমিকে, যেদিন সব collapse করে যাবে। তাই প্রবল চাহিদার (ঈপ্সিতের) মাঝে জীব আজও নিজেকে খুঁজে চলেছে।

জীব অগণিত কোটি বৎসর ভোগ করা সত্ত্বেও তার ভোগ পিপাসা মিটছে না। আমরাও একই ভোগের লালসায় এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ অবস্থা হতে শান্তি কি নেই? আছে। যেকোন অবস্থাকে যদি নিজের অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ করে রাখা যায়, সকল দিকই আমার দিক, সকল অবস্থাই আমার

জীব অগণিত কোটি বৎসর ভোগ করা সত্ত্বেও তার ভোগ পিপাসা মিটছে না। আমরাও একই ভোগের লালসায় এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ অবস্থা হতে শান্তি কি নেই?

অবস্থা, এইরূপ অবস্থা যখন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই আসবে শান্তি কিছুটা। ভাব যদি সেই 'আমি'র সঙ্গে বিভোর থাকে, তন্ময় থাকে, তাহলেই হয়। এই ভাব হচ্ছে আদি ভাব। এই ভাবের সঙ্গে যখন একাত্মবোধ হবে, তখন আর কিছু থাকবে না। তখন তোমার বোধে, সবার বোধে আমার বোধ থাকবে। বৃত্তিগুলোও সেই বোধ অনুযায়ী হবে। দেহও সেই বোধ অনুযায়ী হয়ে যাবে। মনও সেই বোধ অনুযায়ী হবে। তখন আমার আমিত্বের আমিত্ব তত্ত্ব-সংযুক্ত হয়ে যুক্ততার মাঝে তত্ত্ব হয়ে যাবে। তথ্য যখন তত্ত্ব হয়ে যায়, তখন তত্ত্ব তথ্যের সন্ধান পাবে। তখন গোল মিটে যাবে। তত্ত্ব না হওয়া পর্যন্ত তখন ধোঁয়া আকারেই থাকে। গুরু বড় কঠিন জিনিস। তত্ত্বের ঢেউ যেন বাড়ি (আঘাত)। তাই দিয়ে মহৎ করতে না পারলে গুরুগিরি চলতে পারে না। গভীর ভাবের সহিত যাঁর ভাব বিনিময় হয়, তাঁর ভাব, তাঁর ভাবনাই বড়।

গুরু বড় কঠিন জিনিস। তত্ত্বের ঢেউ যেন বাড়ি (আঘাত)। তাই দিয়ে মহৎ করতে না পারলে গুরুগিরি চলতে পারে না। গভীর ভাবের সহিত যাঁর ভাব বিনিময় হয়, তাঁর ভাব, তাঁর ভাবনাই বড়।

তত্ত্বজ্ঞ হতে গেলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হতে হবে। মননের সুরে খনন করতে হবে। খুঁড়তে না খুঁড়তেই জল মেলে না। বিশ্বলোক খুঁড়তে হবে। গাছ চাঁছলে তবেই রস বের হবে। তুমি খুঁজবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেই মিলনেওয়ালা (স্রষ্টা) মিলিয়ে দেবে। পথ তোমার বের করতে হবে। খুড়নেওয়ালা আগেই খোঁড়ার (খনন করার) জিনিসপত্র রেখে গেছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি, এগুলিই হলো খন্তা, দা, শাবল ইত্যাদি। এই খুঁড়নেওয়ালা (বিবেকরূপী চৈতন্য) দা, কুড়াল, খন্তা (ইন্দ্রিয়গুলি) ইত্যাদি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, কোথায় প্রকৃত জল আছে। বৈঠা ধর, হাল ঠিক রাখবে, তবেই মহাসাগরে পৌঁছাবে। ঊর্দ্ধে যখন উঠছো, ঊর্দ্ধে তাকিয়ে থাক। ঊর্দ্ধলোকে অর্থাৎ সহস্রারগামী যাঁর দৃষ্টি থাকে, তাঁরই সিদ্ধিলাভ হয়; সিদ্ধি তাঁরই কাছে আসে। আজ এই থাক।

ঊর্দ্ধে যখন উঠছো, ঊর্দ্ধে তাকিয়ে থাক। ঊর্দ্ধলোকে অর্থাৎ সহস্রারগামী যাঁর দৃষ্টি থাকে, তাঁরই সিদ্ধিলাভ হয়; সিদ্ধি তাঁরই কাছে আসে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ১১৫)
ফোন - ৯৩৩০৯৮০৪২৩

২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান

৩) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯

৪) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা - ৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬